প্রকাশকের নিবেদন

সমাজ-সেবক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী মহাশয়ের "সমাজ বিপ্লব" গ্রন্থ সত্য সত্যই বাংলার হিন্দু সমাজে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। মিথ্যা জাতিভেদ ও অসার দম্ভ হিন্দু জাতিকে জীর্ণ, শীর্ণ, দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে। সমাজদ্রোহী ও দেশবৈরীদের কথা দূরে থাকুক সমাজ সংস্কারক ও দেশভক্তেরাও অনেকে ভারতের তথা হিন্দু জাতির মহাশত্রু এই জাতিভেদের সিংহাসনকে সুদৃঢ় রাখিতে বদ্ধ পরিকর। অনেকে সাহস করিয়া সত্য কথা বলিতে চান না। এই মহাপাপে জাতির ভাগ্য হইতে দুঃখের অমানিশা কিছুতেই কাটিতেছে না। বেদশাস্ত্রী মহাশয় হিন্দুজাতির বন্ধুরূপে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় সমাজের গলিত ক্ষতের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছেন। দেশবাসী তাঁহার এই মহদুদ্দেশ্যকে বুঝিতে পারিয়াছে। তাই "সমাজ বিপ্লবের" প্রথম সংস্করণ অতি অল্প সময়েই নিঃশেষ হইয়াছে। এবার পরিবর্ত্তিত, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত কলেবরে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

১লা বৈশাখ, ১৪০৫

সম্পাদকের নিবেদন

এই পুস্তকটির প্রথম সংস্করণের ন্যায় তৃতীয় সংস্করণও নিঃশেষিত হওয়ায় পাঠকদিগের চাহিদাপূরণের জন্য পুস্তকটি পুনঃ প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের সম্পাদনার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়া আমি আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করিতেছি।

—পণ্ডিত নচিকেতা

সমাজ-বিপ্লব

যুদ্ধং দেহি!

হে ভারতের কোটি কোটি পদাহত শূদ্র! ব্যথিত গণশক্তি! সমাজের আসুরিক আভিজাত্য নির্ম্মম স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে দলিতা ফণিনীর মতো গর্জিয়া উঠ। দানবী শক্তির নিষ্ঠুর বিধান ও কল্পিত শাস্ত্রের বর্ব্বর অনুশাসনের বিষদাঁত সমূলে উৎপাটন কর। বিপ্লবের রক্তনিশান অত্যাচারের বুকের উপর উড়াইয়া দিয়া ঘোষণা কর—যুদ্ধং দেহি! যুদ্ধং দেহি! অপমান অত্যাচারের রুদ্ধ ব্যথা তোমার হৃৎপিণ্ডে বাড়বাগ্নির মত জ্বলিয়া উঠুক। শিরায় ধমনীতে বিদ্রূপের মর্ম্ম পীড়ণ তোমাকে আগ্নেয় গিরির তপ্ত ধাতুর মত রুদ্রানলে দগ্ধ করুক। কে বলে তুমি ঘৃণ্যশূদ্র হেয় অস্পৃশ্য? ঐ দেখ সমগ্র জগতে জাগরণের প্রলয়-বহ্নি মহাকাল মূর্ত্তিতে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তুমিও আজ জ্ঞানে গরিমায় পাণ্ডিত্যে প্রতিভায় মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের মত জ্বলিয়া উঠ। অসত্য কপটতা, হিংসাদ্বেষ ঘৃণার বিষাক্ত আবর্জ্জনা ভষ্মীভূত হউক। মুষ্টিমেয় স্বার্থপর যাদুমন্ত্রে ভেল্কী বাজিতে এতদিন সুপ্ত সিংহের মত অসার অচেতন ছিলে। এইবার ভণ্ডামি শঠতার উচ্চ সিংহাসন পদাঘাতে বিচূর্ণ কর। কেন তোমরা ঘৃণ্য হইয়াছ? কেন তোমরা ভীরু কাপুরুষ পশুর মত অন্যের কৃপা ভিক্ষা করিতেছ? তোমাদের দাস মনোভাবই তোমাদিগের পরাধীন কাপুরুষ করিয়াছে। আজ ঘোষণা কর—বিপ্লবের বিজয় শঙ্খ সমাজের স্তরে স্তরে বাজাইয়া ঘোষণা কর—"আমরা মানিব না অত্যাচারীর অন্যায় আদেশ, আর মানিব না আমরা গুরু পুরোহিত মোহান্ত পাণ্ডা গোঁসাই ব্রাহ্মণের ব্যর্থ ভ্রূকুটি। মনুষ্যত্বের অবমাননা পদাঘাতে চূর্ণ করিব।" ঘোষণা কর শূদ্র সিংহ—যদি কোনও শঠ প্রবঞ্চক গুরুরূপে তোমার গৃহে বার্ষিক রাজস্ব আদায় করিতে আসিয়া তোমাকে প্রচুর পরিমাণে উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ও পাদোদক পান করায় এবং তোমার হস্তের বিশুদ্ধ অন্নব্যঞ্জন বা পানীয় জল গ্রহণেও কুণ্ঠিত হয় তবে সেই পাষণ্ড অর্থ-লোভী ধূর্ত্তকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিয়া গৃহ হইতে বিদায় করিবে। সে তোমার গৃহে অর্থ অপহরণের জন্যই আসিয়াছে। ঘৃণার ব্যবধানে সে তোমাকে ভগবান হইতে অতিদূরে রাখিয়াছে। এমন গুরুকে যত শীঘ্র সমুচিত শিক্ষা

দিবে ততই তোমার মঙ্গল। যদি কোন পুরোহিত তোমার গৃহে দেব পূজার নামে আসিয়া পেট পূজার জন্য অর্থ শোষণ করে, তোমার মাতা-পিতাকে "দেব দেবীর" স্থানে তোমার দ্বারা "দাস বা দাসী" বলিয়া সম্বোধন করায়, তোমার বাড়ীতে দেবতার ভোগে সুপক্ক অন্নের পরিবর্ত্তে অপক্ক আতপ তণ্ডুল ব্যবহার করে, তোমাকে নিজ হাতে পূজা করিতে না দিয়া নিজেই এক রাত্রিতে ১০০ খানি কালী পূজা শেষ করে, তবে সেই সব ধূর্ত্ত পাষণ্ডকে তদ্দণ্ডেই উচিতরূপে বিদায় কর। যদি কোনও মন্দির বা দেব বিগ্রহ তোমার অর্থ দ্বারা পরিপুষ্ট হয় কিন্তু তোমার প্রবেশে বা ছায়া স্পর্শেই নষ্ট হইয়া যায়—তবে সেই সব মন্দিরে প্রবেশ ও দেব পূজা যজ্ঞাদির অধিকারের জন্য সত্যাগ্রহ অবলম্বন কর নতুবা মন্দিরের সহিত সর্ব্ব প্রকারের সহানুভূতি রহিত কর। শৈশব কাল হইতে মন্দির তোমার বুকের উপর বসিয়া তোমার রক্ত শোষণ করিয়াছে এবং জগতের সম্মুখে অপমান ও ঘৃণার তাণ্ডব লীলা চালাইয়াছে। সে মন্দিরে পাথরের দেবতা দর্শন করিতে গিয়া তোমার হৃদয়ের জাগ্রত দেবতাকে অপমান করিও না। সংকীর্ণচেতা ও স্বার্থপরদের এসব মন্দিরের দেবতা দেবতা নয়—ধূর্ত্ত শঠ ব্যবসায়ীদের জুয়াচুরির সকল উপকরণ মাত্র। ঐ সব মন্দির ভাঙ্গিয়া ফুটবল খেলার মাঠ, চিকিৎসা কেন্দ্র বা বিদ্যালয় প্রস্তুত করিলেও দেশের বহু উপকার হইবে। তোমার স্পৃষ্ট অন্নব্যঞ্জন পানীয় জল যাহাদের নিকট অব্যবহার্য তাহাদের স্পষ্ট ঘৃণা-অপমান মিশ্রিত অন্ন জলাদি তুমি প্রাণ গেলেও গ্রহণ করিও না। তুমি ধনবান হইলে অনেকেই তোমার গৃহে সঙ্গোপনে আসিয়া অন্ন-জল গ্রহণ করে কিন্তু মনে রাখিও তাহারা তোমার স্নেহ ও সম্মানের জন্য অন্নজল গ্রহণ করে না, তাহারা তোমার অর্থের সম্মান রক্ষা করিয়া যায়। যতক্ষণ তোমার সমাজের একটি ব্যক্তিও পদদলিত বা লাঞ্ছিত থাকিবে ততক্ষণ তুমিও পদদলিত ও লাঞ্ছিত। তুমি যদি কিল খাইয়া কিল চুরি কর তোমার দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইবে। যে তোমার গৃহে প্রকাশ্যে অন্নজল গ্রহণ করিবে না তুমিও প্রতিজ্ঞা কর তাহার গৃহে তুমি প্রাণান্তেও অন্নজল গ্রহণ করিবে না। ইহাকেই বলে নীতি শাস্ত্র। যদি এই জীবন সংগ্রামে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে চাও তবে "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এই নীতি বাক্য অবলম্বন কর। যে তোমাকে মধুর বচন কহিবে তুমি তাহার সহিত প্রেমালিঙ্গন কর। যে তোমার উপর ঘৃণাভরে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিবে তুমি তাহার প্রতি বজ্রমুষ্টি দেখাও। যে তোমার উপর ভ্রূকুটি দেখাইবে তুমি তাহার প্রতি রক্ত আঁখির তীব্র দৃষ্টি

দেখাইবে। ইহার নাম হিংসা বিদ্বেষ নয়—শিক্ষা। ক্ষিপ্ত কুকুরের সম্মুখে "তৃণাদপি সুনীচেন" এই বৈষ্ণবোচিত দৈন্য দেখাইলে নির্ব্বোধ কুকুর তোমাকে দংশনই করিবে। যেমন কুকুর তেমন মুগুর—ইহাই হইল নীতি-শাস্ত্রের উপদেশ। যে ব্যক্তি অত্যাচার বা অপমান করে সে ত পাপী কিন্তু যে অত্যাচার ও অপমান নীরবে সহ্য করে সে মহাপাপী।

আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের শাসনমঞ্চ হইতে যেদিন ক্রীতদাস নিগ্রোদের মুক্তিবাণী ঘোষণা করা হইল সে দিন সহস্র সহস্র ক্রীতদাস চীৎকার করিয়া বলিল "আমরা মুক্তি চাই না। পরাধীনতার মধুর বেষ্টনীতে আমরা বেশ শান্তিতে আছি। আমরা স্বাধীনতার অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না।" ইহারই নাম মনোভাব। যে সব ক্রীতদাস এতদিন গো মহিষ ছাগ শিশুর মত হাটে বাজারে বিক্রীত হইত, যাহাদের মাতা ভগ্নীর সতীত্ব ছিল বিলাসী ধনীর বিলাসের উপকরণ, যাহাদের জীবন-মৃত্যু ছিল মদগর্ব্বী স্বেচ্ছাচারী বণিকের বৈষয়িক সামগ্রী তাহারাই আজ স্বাধীনতার ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। গোলামির মাদকতা তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, পদলেহনেরা মোহ-মদিরা তাহাদিগকে আত্মহারা করিয়াছে। যাহাদের মুক্তির জন্য আমেরিকার গৃহযুদ্ধে (Civil War) শত সহস্র তরুণ যুবক যাহাদের জন্য হৃৎপিণ্ডের উষ্ণরক্ত ঢালিয়া দিয়াছিল আজ তাহারা মুক্তির মঙ্গল গীতি শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু তরুণের দল নির্ম্মম কষাঘাতে সেদিন নিগ্রোজাতির নিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছিল। ক্রীতদাসদের সেদিন বেত্রাঘাতে শিখাইতে হইয়াছিল—তাহারা স্বাধীন, তাহারা মুক্ত; তাহাদের জীবন দানবী শক্তির পদতলে নিষ্পেষিত হইবার জন্য সৃষ্ট নয়। স্বাধীনতার রুদ্র ধ্বনি বৎসরের পর বৎসর এইভাবে শুনিতে শুনিতে তাহাদের আত্মচৈতন্য দেখা দিয়াছিল। ভারতের বিরাট বিশাল শূদ্রজাতি আজ কালনিদ্রায় নিদ্রিত। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ছিল মাত্র ছয় মাস কিন্তু এ জাতি শত শত বৎসর ধরিয়া দাসত্বের কাল নিদ্রায় নিদ্রিত। কত মহাপুরুষ কম্বুকণ্ঠে এই জাতির জাগরণের রুদ্র আহ্বান শুনাইয়াছেন, কত সংস্কারক এই জাতির মুক্তি বেদীতে জীবন বলি দিয়াছেন—হৃদয় রুধির তর্পণ করিয়াছেন কিন্তু এ জাতি এখনও নিদ্রিত নিশ্চল নিথর। পরাধীনতার আত্মগ্লানি ইহাকে ব্যথিত করিতে পারে নাই। পদাঘাত, অপমান, ঘৃণা, ব্যঙ্গের বিষবাণ ইহাকে জর্জ্জরিত করিতে পারে নাই। দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য কত ধর্ম্মবীর আত্মাহুতি দিয়াছেন কিন্তু জাতি সেই শৃঙ্খল হস্তপদে সযত্নে নিবদ্ধ রাখিয়া আনন্দে

আত্মহারা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, শৃঙ্খল মোচনে বাধা দিয়াও ইহারা দাসত্বের জীবনকে সার্থক করিয়াছে। সামাজিক দাসত্বের নাগপাশ জাতিকে বজ্র বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে।

আজ চাই স্বাধীনতা—পূর্ণ স্বাধীনতা রাজনৈতিক হউক ধর্ম্মনৈতিক হউক সমাজ-নৈতিক হউক অন্ধ বিশ্বাস ও দাস-মনোভাবকে নির্ম্মমের মত গলা টিপিয়া মারিতে হইবে। রাজনৈতিক পরাধীনতা একদিনে আসে নাই। এ দাস মনোভাব একদিনে জাতির মধ্যে সংক্রামিত হয় নাই। বংশপরম্পরায় শৈশবকাল হইতেই অগণিত শূদ্র ক্রীতদাসের মত ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিয়া দাস সাজিয়াছে। আজ বালক বালিকাদিগকে গায়ত্রীর অভয় মন্ত্রে দীক্ষা দাও। গৃহে গৃহে বেদ উপনিষদের সাম্যবাদ আলোচনা কর। এখনও যাহারা দ্বিজত্ব পরিহার করিয়া শূদ্রত্বের ঘৃণ্য জীবন যাপন করিতেছে তাহাদিগের যজ্ঞোপবীত প্রদান কর—পৈতার আতঙ্ক ও ব্রাহ্মণ-ভীতি অপসারিত হউক। সহস্র বৎসর ধরিয়া একগাছা পৈতার অজুহাতে যে পাশবিক অত্যাচার ও শঠতার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে পৈতা গ্রহণ করিয়া পৈতার সেই দাম্ভিকতা নষ্ট কর। যজ্ঞোপবীতের সাম্যবাদ স্থাপন কর। নববলে বলীয়ান হইয়া নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমে মনঃপ্রাণকে প্রবুদ্ধ কর, পশুত্ব বিদূরিত হইবে। নিজেই নিজেকে প্রতারণা করিয়া আর কতকাল পরের মুখে ঝাল খাইবে? তোমার স্থানে কি অন্যে ভগবানের নিকট কান্নাকাটি করিতে পারে? মন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধার অঞ্জলি জ্ঞাপন কর তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন। আকুল প্রাণে ঐকান্তিকতার সহিত তাঁহার করুণার কথা স্মরণ কর—শুষ্ক হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যাইবে ভাড়াটিয়া পুরোহিত দ্বারা ভগবানের পূজা করিলে কোনই ফল হইবে না। ভগবান তোমার ভক্তি তোমার নিকটেই আশা করেন অন্য লোকের মারফতে তিনি তোমার ভক্তি আশা করেন না। ঘরে ঘরে শুদ্ধির মন্ত্র প্রচার কর। পৃথিবীর যে কোনও নরনারী যে কোন ধর্মে প্রবেশ করিবার অধিকার রাখে। যদি কোন মুসলমান খৃষ্টান, নিগ্রো কাফ্রী এই বৈদিক ধর্ম্মে আসিতে ইচ্ছুক হয় গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ কর। কল্পিত জাতিভেদের দৃঢ় সিংহাসনকে পদাঘাতে বিচূর্ণ কর। অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ ও বিধবা বিবাহের প্রচলন দ্বারা নারী জাতিকে নিষ্ঠুর সমাজের হাত হইতে রক্ষা কর। অস্পৃশ্যতারূপী মহা রাক্ষস আজ হিন্দু সমাজের শান্তিনিকেতনে অশান্তির দাবাগ্নি জ্বালাইয়াছে ইহাকে বিনষ্ট করিয়া মানব জাতির মধ্যে অবাধ আহার

বিহারের প্রচলন কর। দেশ ও সমাজ নন্দনকাননে পরিণত হউক। হিংসা বিদ্বেষ চিরতরে বিনষ্ট হউক বিপ্লবের পতাকা হস্তে পল্লীতে পল্লীতে গৃহে গৃহে এই মুক্তিবাণী প্রচার কর। যদি কোন স্বার্থপর প্রবঞ্চক এই সাম্য প্রচারে বাধা দেয় তবে তাহাকে দেশদ্রোহী বলিয়া জানিবে। সাম্যবাদের বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি নাই, পাণ্ডিত্য নাই, শাস্ত্র নাই। যে শাস্ত্র মানুষকে মানুষের অধিকার হইতে বঞ্চিত করে সে শাস্ত্র মলমূত্রবাহী নর্দ্দমায় নিক্ষেপ কর। মানুষ শাস্ত্রবিধির জন্য নহে—শাস্ত্রবিধিই মানুষের জন্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে সেইরূপ বিপ্লব চাই। বিপ্লবের রুদ্র ঝঞ্ঝায় দেশের ও সমাজের জমাট বাঁধা বিষাক্ত বায়ু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হউক। রুদ্রদেবের উষ্ণ নিঃশ্বাসে নীচতা হীনতা ভেদাভেদ ভস্মীভূত হউক —দগ্ধ সমাজের চিতাভস্মের উপর নূতন সমাজকুঞ্জ গড়িয়া উঠুক।

ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি

সেই অতীতযুগে যখন শত সহস্র জাতি বা উপজাতির সৃষ্টি হয় নাই, যখন পার্শী জৈন, বৌদ্ধ খৃষ্টান, হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন শব্দই সৃষ্ট হয় নাই, সমাজে এমনকি যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণের উদ্ভবই হয় নাই তখন "ব্রাহ্মণ" বলিতে বুঝাইত বিশ্ববাসী নরনারী। মনুর সন্তান বলিয়াই মানব বা ম্যান এবং আদমের সন্তান আদমী। কিন্তু মনু ও আদম যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণই করেন নাই তখন একমাত্র ব্রহ্মের অগ্রজন্মা সন্তান "ব্রাহ্মণ" দ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণ ছিল। তখন ধনীদরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, চোর দস্যু রাজা প্রজা, ব্যবসায়ী শ্রমজীবী, শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ নরনারী মাত্রেরই ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইত। মহর্ষি ভৃগু এই জন্যই বলিতেছেন "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণনাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভিঃ বর্ণতাং গতম্॥ (মহাভারত শান্তি পর্ব ১৮৮ ১০) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। কেন না পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ দ্বারাই জগৎ পূর্ণ ছিল। তাঁহারাই পৃথক পৃথক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন।" ভীষ্ম বলিতেছেন "তস্মাদ্বর্ণা ঋজবো জাতিবর্ণাঃ" অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই সাধু এবং একে অন্যের জাতি।" ব্রাহ্মণই পরবর্ত্তী যুগে বিভিন্ন গুণ কর্ম্ম স্বভাব

অনুসারে ঋষি মুনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, রাক্ষস দৈত্য দানব, নাগ যক্ষ কপি, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান, নিগ্রো কাফ্রী ইহুদি, আর্য্য অনার্য্য যবন ম্লেচ্ছ নামে পৃথক ও বিভক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণকে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অত্রি সংহিতা বলিতেছে ঃ দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ। পশুম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ। ৩৬৪ ব্রাহ্মণ দশ প্রকারের যথা দেব মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চাণ্ডাল। মহর্ষি অত্রির মতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চাণ্ডাল ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। পশু ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ইনি বলিতেছেন ঃ "ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ। পশুরুদাহৃতঃ। ৩৭২। অর্থাৎ গলায় মাত্র পৈতা করিয়া যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণত্বের গর্ব্ব করে অথচ ব্রহ্ম তত্ত্ব জানে না এই পাপে তাহাকে পশু ব্রাহ্মণ বলা হয়।" তাহার গলায় পৈতা ও গো মহিষ ছাগাদির স্কন্ধে রজ্জু একই প্রকারের। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের প্রাচুর্য্যেই ত দেশ ও সমাজ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ বা নরগণ যখন শত্রুর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতেন তখন তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় (Military power) বলা হইত, কৃষি বাণিজ্য করিলে বৈশ্য (Trading class), সমাজ সেবা (Social Service) করিলে শূদ্র এবং শারীরিক পরিশ্রম না করিয়া চিন্তা শক্তির দ্বারা সমাজ সেবা করিলে তাঁহাদিগকে নূতন সংজ্ঞা বা উপাধি না দিয়া শুধু ব্রাহ্মণই বলা হইত। একই ব্যক্তি একই জীবনে বৃত্তি অনুসারে কখনও ব্রাহ্মণ কখনও ক্ষত্রিয়, কখনও বৈশ্য বা কখনও শূদ্র সংজ্ঞা পাইত। চারি বর্ণের মধ্যে তখন অবাধে বৈবাহিক আদান প্রদান ও পান ভোজন চলিত, সকলেই বেদপাঠ ও ভগবদুপাসনা করিতে পারিত। আর্য্য জাতি তখন সব একাকার ভারতের তখন স্বর্ণ যুগ।

তখন বিবাহে জাতিভেদ ছিল না। "অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তা ধমযোনিজা। শারঙ্গী মন্দপালেন জগামোভা হর্ণীয়তাম্॥ (মনু সংহিতা ৯২৩) অর্থাৎ মহর্ষি বশিষ্ঠ নিকৃষ্ট কুলোৎপন্না অক্ষমালাকে এবং মহর্ষি মন্দপাল অধম কুল হইতে উৎপন্না সারঙ্গীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।" ইহাদের পুত্রেরা সকলেই পিতৃবর্ণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন; কোন নূতন জাতির সৃষ্টি হয় নাই। মহর্ষি কৌৎস বিবাহ করিলেন ক্ষত্রিয় রাজা ভগীরথের কন্যাকে। এই রূপে মহর্ষি অঙ্গিরা ক্ষত্রিয় মরুত্তের কন্যাকে, মহর্ষি হিরণ্যহস্ত ক্ষত্রিয় মদিরাশ্বের কন্যাকে, ব্রাহ্মণ ঋষ্যশৃঙ্গ ক্ষত্রিয় দশরথের কন্যা শান্তাকে, জমদগ্নি ক্ষত্রিয়

প্রসেনজিতের কন্যা রেনুকাকে, মহর্ষি ভৃগুর ব্রাহ্মণ পুত্র চ্যবন ক্ষত্রিয় শর্য্যাতির কন্যা সুকন্যাকে, মহর্ষি ঋচিক ক্ষত্রিয় গাধির কন্যা বা বিশ্বামিত্রের ভগ্নী সত্যবতীকে অবাধে বিবাহ করিয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ বংশেও অব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ বংশেও ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিতেন। মনুর পুত্র ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্ট নামক ক্ষত্রিয় বংশের উৎপত্তি। ধার্ষ্টগণ ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন (শ্রীমদ্ভাগত-শ্রীধর টীকা ৯।২।১৭৬)। দিষ্ট ছিলেন ক্ষত্রিয় কিন্তু তাঁহার পুত্র নাভাগ বৈশ্য; ইনি বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) নাভাগারিষ্টের দুই বৈশ্য পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন (হরিবংশ ১১।৬৫৮)। মনুর দৌহিত্র পুরূরবার বংশে জন্মিয়াছিল ক্ষত্রিয় শুনক। এই শুনকের বংশে চারি বর্ণই জন্মিয়াছে (বিষ্ণু পুরাণ ৩।৮১)। ক্ষত্রিয় বিজয়ের পুত্রই মহাত্মা কপিল। বিজয়ের অন্য পুত্র সুহোত্রের গৃৎসমতি নামক পুত্রের বংশেও চারিবর্ণের উৎপত্তি হয় (হরিবংশ ৩২ পুরূরবার বংশে ক্ষত্রিয় রভস জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার গোত্র হইতে বহু ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন (ভাগবত ৯।১৭।১০)। পুরুর বংশে ক্ষত্রিয় মেধা তিথি জন্মগ্রহণ করেন, এই মেধাতিথি হইতেই কাণ্বায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করেন (বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৯।২)। ক্ষত্রিয় রাজ অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধাদি ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন (ভাগবত ৯।২১।২১)। অজমীঢ়ের বংশে মুদ্গলের জন্ম, এই মুদ্গল হইতেই মৌদ্গল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি (মৎস্য পুরাণ)। গর্গ, সংস্কৃতি ও কাব্য নামক তিনজন মহর্ষি ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন (মৎস্য পুরাণ)। গর্গ হইতে শিনি এবং তাঁহা হইতে ক্ষত্রিয়-গার্গগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। গর্গের ভ্রাতা মহাবীর্য্যের পুত্র ক্ষত্রিয় উরুক্ষয়ের তিন পুত্র ত্র্যারুণ, পুষ্করী ও কপি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন (মৎস্য পুরাণ)। কুরুবংশীয় ক্ষত্রিয় ঋষ্টি সেনের পুত্র দেবাপি স্বীয় ভ্রাতা শান্তনুর পৌরহিত্য করিয়াছিলেন (নিরুক্ত ২।১০)। সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন (মহাভারত শল্য ৪০)। ক্ষত্রিয় জনক ব্রাহ্মত্ব লভে করেন (শতপথ ব্রাহ্মণ)। শুধু তাহাই নয়—জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাশরঃ। শুক্যাঃ শুকঃ কণাদাখ্যঃ তথোলুক্যাঃ সুতোহ ভবৎ॥ মৃগীজঋষ্যশৃঙ্গোঽপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ। মন্দপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্য উচ্যতে॥ মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্তু মণ্ডুকী গর্ভসম্ভবঃ বহবোহন্যেঽপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে শূদ্রযোনয়ঃ॥ (ভবিষ্য পুরাণ ব্রাহ্ম পর্ব্ব-৪২ অধ্যায়—বজ্রসূচী দ্রষ্টব্য অর্থাৎ কৈবর্ত্ত কন্যার গর্ভজাত মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন

বেদব্যাস, শ্বপাক অনার্য্য কন্যার গর্ভজাত শাস্ত্রকর্ত্তা পরাশর (ব্যাসের পিতা), ম্লেচ্ছ কন্যা শুকীর গর্ভজাত শুকদেব (ব্যাসের পুত্র ; অনার্য্য কন্যা উলুকীর গর্ভজাত বৈশেষিক দর্শনাকার কণাদ; শূদ্র কন্যা মৃগীর গর্ভজাত ঋষ্যশৃঙ্গ ; বেশ্যার গর্ভজাত মহর্ষি মন্দপাল : ব্যাধ জাতীয় কন্যা মণ্ডুকীর গর্ভজাত ঋষি মাণ্ডব্য ; ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। বারবিলাসিনী জবালার পুত্র সত্যকাম ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বংশে জন্মিয়াও অভিমন্যুর জাতকর্ম্ম প্রভৃতি শুভকর্ম্মে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন (মহাভারত আদি পর্ব্ব ২২১ বর্ধমান রাজবাটীর)। ক্ষত্রিয়া রেনুকার গর্ভে জন্মিয়া পরশুরাম ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন (মহাভারত-বন ১১৫।১৬)। অন্ধ মুনি বৈশ্য ছিলেন। তাঁহার শূদ্রানী স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ সিন্ধু মুনি। ইঁহাকেই বধ করিয়া দশরথ ব্রহ্ম হত্যার পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন (রামায়ণ, অযোধ্যা ৬৩।৫১)। দাসী পুত্র কক্ষীবাপ পূজনীয় ঋষি এবং দাসীপুত্র নারদ দেবর্ষি হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ জরৎকারু অনার্য্য নাগ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইঁহারই গর্ভে ব্রাহ্মণ আস্তিক মুনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাই হইল ভারতের স্বর্ণযুগ। এই জন্যই ভারত ছিল স্বাধীন ও পরাক্রমশালী।

তখন ভক্ষ্যাভক্ষ্যেরই বিচারমাত্র ছিল কিন্তু আহারাদিতে জাতিভেদ ছিল না। বেদ বলিতেছেন—"ওঁম্ সমানী প্রপা সহবোঽন্ন ভাগাঃ সমানে যোক্তে সহবো যুনজ্মি (অথর্ব্ব দেব ৩।৩০।৬) অর্থাৎ হে মনুষ্য! তোমাদের জলপানের স্থান এক হউক, তোমাদের ভোজন এক সঙ্গেই হউক। আমি তোমাদিগকে একসঙ্গে মিলাইয়াছি।" গোঁড়া পণ্ডিত সায়নাচার্য্যও এই মন্ত্রের ভাষ্য করিতে গিয়া লিখিতেছেন—"সহবোঽন্ন ভাগাঃ অন্নভাগশ্চ সহএব ভবতু পরস্পরানুরাগবশেন একত্রাবস্থিতমন্নপানাদিকং যুষ্মাভি রূপভোজ্যতামিত্যর্থঃ॥ অর্থাৎ তোমাদের অন্নভোগ একসঙ্গে হউক। পরস্পরের প্রতি স্নেহ বৃদ্ধি করিবার জন্য তোমরা একসঙ্গে অন্নপানাদি গ্রহণ কর।" প্রাচীনকালে রাজসূয়াদি যজ্ঞে চারিবর্ণ একসঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়াই ভোজন করিত। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে তখন কেহই পাচক বৃত্তি করিত না। সূদ সূপকার আদি শূদ্রেরাই তখন রন্ধনশালায় রন্ধন করিত। মহর্ষি আপস্তম্ব বলিতেছেন—"আর্য্যাধিষ্ঠীতা বা শূদ্রা সংস্কর্ত্তার স্যুঃ (আপস্তম্ব ২।২।৩।৪) অর্থাৎ আর্য্যাদের অধ্যক্ষতায় শূদ্রেরাই রন্ধন করিবে।" তখন শূদ্র অর্দ্ধে

নিরেট মূর্খ বুঝাইত। মহর্ষি মনু বিধান দিতেছেন যে শূদ্রগণ দাস্য কর্ম্মদ্বারা জীবিকার্জ্জনে অক্ষম হইলে সূপকার কর্ম্ম (পাচক গিরি) করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিবে (১০।৯৯)। স্কন্দ পুরাণও বলিতেছেন—"বিপ্রাদি বর্ণত্রয়স্য সেবনং শূদ্র কর্ম্মশ্চ। জীবেচ্চ সততং শূদ্র শ্চক্ষমে কারকর্ম্মণা॥ অর্থাৎ বিপ্রাদি তিন বর্ণের সেবা করাই শূদ্রের কার্য্য, অক্ষম হইলে পাচক-গিরি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিবে।" মহর্ষি মনু অন্য একস্থানে বলিতেছেন—"আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রশ্চ গোপাল দাস নাপিতৌ। এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ" (মনু সংহিতা ৪।২৫৩) অর্থাৎ যে ব্যক্তি কৃষিকার্য্য করিয়া আর্দ্ধেক ভাগ দেয়, কুলমিত্র, গোপালক, চাকর, নাপিত ও আত্মাসমর্পণকারী শূদ্র ইহাদের অন্ন ভোজন করা যায়।" বিষ্ণু (৫৭।১৬) যাজ্ঞ বাক্য (১।১৬৭) যম (১।২০) পরাশর (১১।২০) গৌতম (৭ম অধ্যায়) ও ব্যাস (৩।৫১) সংহিতাতে এবং কুর্ম্ম (উপরি ১৭।১৭) ও গরুড় (পূর্ব্বে ৯৫।৬৬) পুরাণেও এই ব্যবস্থাই প্রদত্ত হইয়াছে। "পায়সং স্নেহপক্কং যদ্ গোরস শ্চৈব শক্তবঃ। পিণ্যাক শ্চৈব তৈলঞ্চ শূদ্রাদ্ গ্রাহ্যংদ্বিজাতিভিঃ॥ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ- ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ শূদ্রের পায়স, ঘৃত পক্ক দ্রব্য, দুগ্ধ, ছাতু, তিলের লাড্ডু ও তৈল ভক্ষণ করিতে পারে। "মহর্ষি আপস্তম্ব স্বীয় ধর্মসূত্রে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বর্ণনায় প্রশ্নোত্তর রূপে লিখিতেছেন—ক আশ্যান্ন (১।৬—১৯) "কাহার অন্ন খাইতে হইবে? "ইপ্সোদতি কন্বঃ (১।৬-১৯) "কন্ব ঋষি উত্তর করিলেন—যে খাওয়াইতে চাহে।" পুণ্য ইতি কৌৎসঃ (৪।১।৬-১৯) "কৌৎস ঋষি উত্তর করিলেন—যিনি পবিত্র শুদ্ধাচারী তাঁহার অন্ন খাইতে হইবে।" যঃ কশ্চিদ্ দদ্যাদিতি বার্য্যায়ণিঃ (৫।১৬।১৯)। "বার্য্যায়ণি ঋষি উত্তর করিলেন—"যে কেহ দিলেই তাহার অন্ন খাইতে হইবে। তখন আপস্তম্ব ঋষি বলিলেন. "সর্ব্ব বর্ণানাং স্বধর্ম্মে বর্ত্তমানানাং ভোক্তব্যম্ "অর্থাৎ স্বধর্ম্মে স্থিত সর্ব্ব বর্ণের অন্নই গ্রহণ করা যায়।" জলপান সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন "এধোদকং মূলফল মন্নমভ্যুদ্যতঞ্চ যৎ। সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্নীয়াম্মধ্বথ ভয় দক্ষিণাম্ (৪।২৪৭) অর্থাৎ কাষ্ঠ, জল, মূল, ফল, অন্ন, মধু, অভয় ও দক্ষিণা আসিয়া উপস্থিত হইলে সর্ব্বস্থান হইতেই গ্রহণ করা যায়।" প্রাচীন কালের একই ব্রাহ্মণ বর্ণ গুণকর্ম্ম স্বভাব অনুসারে চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু পৌরাণিকযুগেও তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান ও অন্নপানাদি গ্রহণ বন্ধ হয় নাই।

তখন জীবিত কালেই বর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিত। জন্মদ্বারা জাতি নির্ণয় করা অতীব কঠিন কার্য্য, কারণ সৃষ্টি ক্রিয়া অতি সঙ্গোপনে সাধিত হয়। কে কাহার জনক এবিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব। অনুমান প্রমাণের উপরেই সব নির্ভর করিতে হয়। মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—"জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে সংকরাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ। সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ। বাঙ্মিথুনমথো জন্মমরণঞ্চ সমংনৃণাং ॥ তাবচ্ছূদ্রসমো হ্যেষ যাবদ্বেদে নজায়তে ॥ অর্থাৎ (বনপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়) হে মহাসর্প! এই মনুষ্য জন্মে সকল বর্ণেরই সংকরত্ব হেতু জাতি নির্ণয় করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। সকল বর্ণের মনুষ্যরাই সকল বর্ণের রমণীতে সন্তান উৎপাদন করিতেছে। সকলের আহার্য্য জন্মমৃত্যু একই প্রকার। যতদিন পর্য্যন্ত বেদজ্ঞান লাভ না করিবে ততদিন মানুষ শূদ্রই থাকে।" জন্মদাতার মাপকাঠি অনুসারে জাতি নির্ণয় করা অসম্ভব বলিয়াই যুধিষ্ঠির বেদকে মাপকাঠি করিয়াছেন। শরীরের রং অনুসারে যদি কেহ বর্ণ ঠিক করিতে যায় তবে ঋষি ভরদ্বাজ এ সম্বন্ধে বলিতেছেন—"চাতুর্ব্বর্ণস্য বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিদ্যতে। সর্ব্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণসংকরঃ ॥ (মহাভারত-শান্তি ১৮৮।১৮৯) অর্থাৎ চতুর্ব্বর্ণের শরীরের বর্ণ দেখিয়া বর্ণ বিচার করিতে গেলে চারি বর্ণের মধ্যেই বর্ণসংকর পাওয়া যাইবে।" কারণ ব্রাহ্মণের গৃহে সবগুলি সন্তানই শ্বেত বর্ণের হয় না। ক্ষত্রিয়ের গৃহে সবগুলিই রক্ত বর্ণের, বৈশ্য গৃহে সব গুলিই পীত বর্ণের এবং শূদ্রগৃহে সব সন্তানগুলিই কৃষ্ণবর্ণের হয় না। শরীরের রং ধরিয়া বিচার করিলে ক্ষত্রিয়ের গৃহে নবদুর্ব্বাদল শ্যাম শ্রীরামচন্দ্র, নবজলধর কান্তি শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রাহ্মণের গৃহে কৃষ্ণবর্ণের কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস, চাণক্য প্রভৃতির উপায় কি? অন্যদিকে ইংরেজ ফরাসী কাবুলি প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গেরা একসঙ্গে ব্রাহ্মণের দলে আসিয়া পড়িবে। এই জন্যই বর্ণ নির্ণয়ের জন্য শাস্ত্রে অন্যরূপ মানদণ্ড বা লক্ষণ রাখা হইয়াছে। বংশের দোহাই দ্বারা বা শরীরের রং দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। যখন আদিম মানব-জাতি ব্রাহ্মণের মধ্যে নানারূপ ব্যভিচার ও মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হইল তখন ব্রাহ্মণত্বের জন্য বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ঠিক করা হইল। জাত কর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ। বেদাধ্যায়ন সম্পন্নঃ ষট্সু কর্ম্ম স্ববস্থিতঃ ॥ শৌচাচার স্থিতঃ সম্যগ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু প্রিয়ঃ। নিত্যব্রতী সত্যপরঃ সবৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ (মহাভারত-শান্তি-১৮৯০ অধ্যায়) অর্থাৎ যিনি জাতকর্ম্মাদি

সংস্কারে সংস্কৃত পবিত্র, বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত, যিনি সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, তপ, হোম, দেবপূজা ও অতিথি সংকার এই ষটকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং যিনি শৌচাচার পরায়ণ নিত্যব্রহ্ম নিষ্ঠ গুরুপ্রিয় নিত্যব্রতীর ও সত্যপরায়ণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলে।" ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হইলে এতগুলি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। এই রূপ ব্রাহ্মণ একজন যে দেশে থাকে সে দেশ ধন্য হয়। যখন ভারতে এইরূপ লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ বাস করিত তখনই ভারতবর্ষ ছিল স্বর্গ ভূমি। আজ এই সব লক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলে ভারতে দশজনও ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবে কিনা গবেষণার বিষয়। লোম বাছিতে বাছিতে কম্বলই শেষ হইয়া যাইবে।

কাম ভোগ প্রিয়াতীক্ষ্ম্যাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়াসাহসাঃ। ত্যক্তা স্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ (ঐ) অর্থাৎ যে সব ব্রাহ্মণ রজোগুণে কামভোগ প্রিয়, তীক্ষ্ম স্বভাব, ক্রোধী, রক্তাঙ্গ ও সাহসী হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে তাহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।" গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ। স্বধর্ম্মানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ ॥ (ঐ) অর্থাৎ যে সব ব্রাহ্মণ হিংসুক, মিথ্যাপরায়ণ, লোভী, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ। কৃষ্ণাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজা শূদ্রতাং গতাঃ। (ঐ) অর্থাৎ যে সব ব্রাহ্মণ হিংসুক, মিথ্যাপরায়ণ, লোভী, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী (যাহার জীবিকার ঠিক নাই) ও শৌচভ্রষ্ট তাহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।" সর্ব্ব ভক্ষ্য রতি নিত্যং সর্ব্বকর্ম্ম করোহশুচিঃ। ত্যক্ত বেদস্ত্বনাচারঃ সবৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥ (ঐ) যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সকল বস্তু খায় ও সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, অশুচি, বেদবিহীন ও আচার ভ্রষ্ট সেই শূদ্র।" শোচন্তশ্চঃ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ। নিস্তেজ সোহল্প বীর্য্যাশ্চ শূদ্রাস্তানব্রবীত্তু সঃ। (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ৮।১৪৯) অর্থাৎ যে সব ব্রাহ্মণ শোকে অভিভূত, অন্যের পরিচর্য্যায় রত, নিস্তেজ অল্পবীর্য্য তাহারাই শূদ্র।" এই ভাবে একই ব্রাহ্মণবর্ণ গুণকর্ম্ম স্বভাব অনুসারে চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই সব লক্ষণ ও বর্ণত্ব কাহারও পক্ষে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পাকাপাকি থাকিত না। যে কোন বর্ণের লোক যে কোন বর্ণে প্রবেশ করিতে পারিত। ধর্ম্মাচর্য্যায়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ। অধর্ম্মচর্য্যায়া পূর্ব্ববর্ণো জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ (আপস্তম্ব ২।৫।১১) ॥ অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণ দ্বারা নিকৃষ্ট বর্ণ ও নিকৃষ্টতর বর্ণকে প্রাপ্ত হয়।" "যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্ ৮

স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ (মনু ২।১৬৮) অর্থাৎ যে দ্বিজ বেদপাঠ না করিয়া অন্যত্র শ্রম করে সে জীবিতাবস্থাতেই আত্মীয় কুটুম্ব সহিত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।" "অশ্রোত্রিয়া অননুবাক্যা অনগ্নয়ো বা শূদ্রসা সধর্ম্মিনো ভবন্তি ॥ (বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ৩।৩) অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঘরে উৎপন্ন হইয়া যে বেদ পাঠ করে না, অন্যকে বেদপাঠ করায় না বা অগ্নিহোত্র করে না সে শূদ্রের সমান।" দক্ষিণ র্থস্তু যো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ। ব্রাহ্মণস্তু ভবেচ্ছূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ (পরাশর ১২।৩৫) অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ দক্ষিণা লইয়া শূদ্রের যজ্ঞ করে সে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া যায় এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া যায়।" "ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু। দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞ শূদ্রেন সাদৃশ্যো ভবেৎ ॥ (মহাভারত-বনপর্ব্ব ২১৫।১৩) অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও দুষ্কৃত হইয়া পতনীয় অসৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকে সে শূদ্রতুল্য।" ব্রহ্মচৈব পরংসৃষ্টং যেন জানান্তি তেহ দ্বিজাঃ। তেষাং বহুবিধা ত্বন্যস্তত্র তত্র হি জাতয়ঃ ॥ পিশাচা রাক্ষসা প্রেতা বিবিধা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ। প্রণষ্ট জ্ঞান বিজ্ঞানাঃ স্বচ্ছন্দাচার চেষ্টিতাঃ ॥ (মহাভারত শান্তি (১৮৯) অর্থাৎ যে সব ব্রাহ্মণ পরমার্থ ব্রহ্ম পদার্থকে জানে না তাঁহারা অতি হীন বলিয়া গণ্য এবং সে সব ব্রাহ্মণ জ্ঞান—বিজ্ঞান-হীন, স্বেচ্ছাচার পরায়ণ ও উচ্ছৃঙ্খল তাহারা পিশাচ, রাক্ষস ও প্রেত প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতি বলিয়া গণ্য হয়।")

অন্যদিকে শূদ্রবর্ণও ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যস্তু শূদ্রোদমেসত্যে ধর্ম্মেচ সততোত্থিতঃ। তং ব্রাহ্মণ মহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ (মহাভারত বন ২১৬) অর্থাৎ যে শূদ্র দম, সত্য ও ধর্ম্মে সর্ব্বদাই আরূঢ় আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করি, কেন না চরিত্র দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়।" শুধু জন্ম দ্বারাই কাহারও শরীর ব্রাহ্মণ হয় না। স্বাধ্যায়েন জপৈহোমৈ স্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ। মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনু ॥ (মনু ২।২৮) অর্থাৎ "স্বাধ্যায়, জপ, হোম, বেদগান, পৌর্ণমাসাদি, সুসন্তানোৎপত্তি, পঞ্চমহাযজ্ঞ, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ এই সব অনুষ্ঠান করিলে তবে ব্রাহ্মণ শরীর গঠিত হয়।" "শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্গুণানুপতিষ্ঠতঃ। বৈশ্যত্বং লভতে ব্রহ্মন্ ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈবচ ॥ আর্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্য-মভিজায়তে। (মহাভারত বন ২১১ অঃ) অর্থাৎ "শূদ্র যোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেহ সদ্গুণান্বিত হয় তবে তাহার বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব এমন কি ব্রাহ্মণত্বও লাভ হয়।" জীবিকা সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিতেছেন "যস্যহীনবর্ণস্য কর্ম্মণা জীবতি তৎসমান জাতিত্বং ভবতি। তথাৎ

ব্রাহ্মণঃ শূদ্রবৃত্ত্যা জীবন তামপরিত্যজন যৎ পুত্রমুৎপাদয়তি সোঽপি তত্রৈব বৃত্ত্যা জীবন্ পুনরপ্যেবং পরম্পরয়া সপ্তমে জন্মনি শূদ্রমেব জনয়তি।" (মিতাক্ষরা) অর্থাৎ হীনবর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করিলে তৎসদৃশ জাতিত্ব লাভ হয়। ব্রাহ্মণ শূদ্র বৃত্তি গ্রহণ করিয়া তাহা যদি পরিত্যাগ না করিয়া সন্তানোৎপাদন করে এবং পুত্রও যদি শূদ্র বৃত্তি গ্রহণ করে তবে সপ্তম পুরুষে শূদ্রত্বই প্রাপ্ত হইবে।" আজ যদি উপরোক্ত এই সব লক্ষণ দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ নির্ণয় করিতে চায় তবে ভারতে ব্রাহ্মণ পাওয়া দুষ্কর হইবে। আজ যাহারা নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন তাঁহাদের অধিকাংশই আজ অন্যবর্ণের জীবিকা গ্রহণ করিয়াছেন। গোয়ালন্দের কুলীগিরি হইতে হাইকোর্টের জজিয়তি পর্য্যন্ত সবই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, মোটরের গাড়োয়ানী, জুতার দোকানের ম্যানেজারী, রজকগিরি, অন্যের দাসত্ব সকলেই গ্রহণ করিয়া অনেকে ব্রাহ্মণত্বের গৌরব করিতেছেন। যাঁহারা বাকী আছেন তাঁহারা 'ত্রিধা ফুৎকার' বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন—প্রথম কর্ণে ফুৎকার বা গুরুগিরি, দ্বিতীয় শঙ্খে ফুৎকার বা পূজারী গিরি এবং তৃতীয় চুল্লীতে ফুৎকার বা পাচক গিরি।

আজ ব্রাহ্মণ বলিলে সেই শান্ত দান্ত বেদজ্ঞ ত্যাগব্রতী স্বচ্ছহৃদয় দেব চরিত্রের কথা মনে হয় না। আজ ব্রাহ্মণ বলিতেই মনে হয় লোভের মূর্ত্তি ক্রোধে অবতার, মোহের চিত্র। কেহ গুরুরূপে শিষ্যাদিগকে শ্রীচরণ তরণীদানে ভবসমুদ্র পার করিতে ব্যস্ত, কেহ বৈশাখ জৈষ্ঠমাসে আর কাঁঠালের সময় দোদুল্যমান ভুঁড়ি লইয়া লম্বোদর মূর্ত্তিতে ভগবানের রাজস্ব আদায় করিতে শিষ্যদের দরজায় উপস্থিত হন এবং ফাটা শ্রীচরণের ধূলি রাশি রাশি পান করাইয়া শিষ্যদের জীবনকে চরিতার্থ করেন। কেহ বা শিষ্যগৃহের গুরুগত-প্রাণ যুবক-যুবতীদ্বারা শ্রীভুঁড়ি, শ্রীঠ্যাং ও সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করাইতে এবং মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট স্বরে সাধন ভজনের গূঢ় রহস্যগুলি নিজ গুণে শ্রীমুখে ব্যক্ত করেন। "ব্রাহ্মণ" বলিতেই আজ মনে হয় কেহ পুরোহিত নামে যজমানের উকিল সাজিয়া ভগবানের আদালতে দুই চারি আনা কোর্টফি বা দক্ষিণার লোভে সারারাত্রি জাগিয়া মা কালীকে ছাগ মহিষের তাজারক্তের লোভ দেখান এবং যজমানের জন্য ধনরত্ন ঐশ্বর্য্য স্ত্রীপুত্রাদি প্রার্থনা করেন। কেহ যজমানের মৃত মাতাপিতাকে লেজ ধরিয়া বৈতরণী পার করাইতে একজোড়া বলিষ্ঠ গাভী প্রার্থনা করেন, রৌদ্র বৃষ্টি শীততাপ হইতে বাঁচাইতে জুতা পালঙ্ক ছাতা বিছানা আদায় করেন। কেহ বা রাহু কেতু শনি অশ্লেষার অশুভ দৃষ্টি হইতে

যজমান পুত্রকে রক্ষার জন্য নানারূপ যাগ যজ্ঞের আয়োজন করেন। ব্রাহ্মণ শব্দের সঙ্গেই আজ মনে হয় কেহ গুরু পুরোহিত পাণ্ডা মোহান্ত রূপ প্রভুবংশ হইয়া কোটি কোটি দাসবংশের উপর বংশপরম্পরায় রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। কেহ বা ভগবানের দালালী বা ঠিকেদারী করিয়া বিনা মূলধনে দেববিগ্রহের ব্যবসা ফাঁদিয়া অন্নবস্ত্র সমস্যার দিনে ভোগে সুখে বিলাসের কেলিকুঞ্জে বিচরণ করিতেছেন। কেহ বা ভাগবত-পাঠক বা প্রভুপাদ গোঁসাই রূপে উপ-ভগবান সাজিয়া সর্ব্বাঙ্গ হরিনামের ট্রেড মার্কায় চিত্রিত করিয়া এবং গলদেশে হরিনামের থলি ঝুলাইয়া ধনী বৈষ্ণবের গৃহে বস্ত্র-হরণ, রাসলীলা, পরকীয়া-প্রেম, যুগল উপাসনার মধুর রস পরিবেশন করিতেছেন শুধু কি তাহাই?

যে ব্রাহ্মণের ত্যাগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান, তেজস্বিতা ও ধর্ম্মপ্রবণতায় আর্য্য জাতি জগতের বুকে একদিন ভাস্করের মত উজ্জ্বল ছিল, তাহাদের বংশধরগণ অনেকে আজ স্বার্থপরতা, ভোগ-তৃষ্ণা, মূর্খতা দুর্ব্বলতা ও নাস্তিকতার দাস। ব্রাহ্মণ দধীচিই না একদিন অসুরের হাত হইতে স্বর্গরাজ্য উদ্ধারের জন্য নিজের জীর্ণ পঞ্জরখানি হাসিমুখে দান করিয়াছিল! বৈশেষিক-দর্শনপ্রণেতা ব্রাহ্মণ কনাদই না শস্যক্ষেত্রের পরিত্যক্ত শস্য কণায় জীবন ধারণ করিয়া বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল! ভারতের ব্রাহ্মণগণ নিজেরাই না সমগ্র জগৎকে সর্ব্বপ্রথমে অধ্যাত্ম-জ্ঞান প্রদান করিয়াছিল! ভারতের দরিদ্র নিঃস্ব ব্রাহ্মণের তেজস্বিতাতেই না দিগ্বিজয়ী ক্ষত্রিয় রাজার শাণিত কৃপাণ সংযত হইত! ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণই না জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া পর্ণ কুটীরে কঠোরতার অগ্নিপরীক্ষায় কাল কাটাইত! কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের বংশধরেরাই আজ ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে! বিশ্বাসঘাতক রূপে ব্রাহ্মণই মুসলমানের সহিত যোগ দিয়া সিন্ধুদেশের হিন্দুরাজা দাহিরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বক্তিয়ার খিলজির নিকট হইতে ১১ লক্ষ টাকার লোভে ব্রাহ্মণ পশুপতিমিশ্রই বঙ্গের হিন্দু নরপতি লক্ষণ সেনের পুত্র কেশব সেনকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যুদ্ধ করিতে নিরস্ত করিয়াছে ও বাংলার সিংহাসনকে বিদেশী আক্রমণকারীর হাতে তুলিয়া দিয়াছে। ব্রাহ্মণই গুরু গোবিন্দ সিংহের দুই শিশু পুত্রকে অত্যাচারী মোগল সম্রাটের নিকট ধরাইয়া দিয়া প্রাচীরের ভিতর প্রোথিত করিয়াছে, ছত্রপতি শিবাজীর মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যকে ব্রাহ্মণ অমাত্যগণ মিলিয়াই ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, উমিচাঁদ ও নন্দকুমার প্রভৃতি কয়েকজন কুটিল ব্রাহ্মণই মিরজাফর ও ক্লাইভের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বাংলার সিংহানকে বিদেশী

বণিকের হাতে তুলিয়া দিয়াছে এবং বিজয় নগরের ব্রাহ্মণ রাজার ভ্রাতা রাজারামই মান্দ্রাজকে ইংরেজ-চরণে অঞ্জলী প্রদান করিয়া সধারূপ পরিচিত হইয়াছে। "ব্রাহ্মণ" শব্দ শুনিলেই আজ মনে হয় মহাপুরুষ শঙ্কর, ভক্ত রামানুজ, প্রেমিক চৈতন্যের প্রতি কি অমানুষিক অত্যাচার। মহাত্মা রামমোহন, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র ও ধর্ম্মবীর দয়ানন্দের প্রতি কি জঘন্য পাশবিক আচরণ। ব্যবস্থাদাতা শাস্ত্রকাররূপে কোটি কোটি শূদ্র-কথিত নরনারীর উপর কি অমানুষিক নিপীড়ন ও নির্ম্মম অত্যাচার। "ব্রাহ্মণ" শব্দের সহিত কতযুগের কত বর্ব্বরতা অত্যাচার ও নীচতার মসীলিপ্ত ইতিহাস বিজড়িত। ভারতমহাসাগরের জলেও সে কালিমা ধৌত হইবার নয়।

বর্ত্তমানযুগে পূর্ব্বপুরুষদের মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্তের জন্য রামমোহন, দয়ানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি এক একজন ব্রাহ্মণ সন্তান যখনই সংস্কার কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন তখনই অন্যদিকে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ সন্তান তাঁহাদের গতি-রোধের জন্য আহার নিদ্রা বিসর্জ্জন দিয়াছে। মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতা হইতে জীবন্ত স্ত্রীকে রক্ষা করিবার জন্য যখন রামমোহন আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন তখন তাঁহাকে গুপ্তহত্যার জন্য একদল ব্রাহ্মণই না ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই না সতীদাহ প্রথাকে রাখিবার জন্য লাটসাহেবের নিকট একসঙ্গে স্বাক্ষর করিয়া এক সুদীর্ঘ আবেদন পত্র পেশ করিয়াছিল! বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিপক্ষে শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিতে না পারিয়া মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগরকে একদা ব্রাহ্মণই না গুপ্তহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল? নবযুগের প্রবর্ত্তক মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী যখন আহিন্দু আপামর জনসাধারণের মধ্যে বেদ প্রচার করিতেছিলেন তখন এক পাচক ব্রাহ্মণ জগন্নাথই না তাহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছে! ভারত-গৌরব স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে বেদান্ত প্রচার করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন তখন ব্রাহ্মণেরাই না তাঁহাকে কলির শূদ্র সন্ন্যাসী বলিয়া বিদ্রূপ ও বিরোধিতা করিয়াছিল! গত য়ুরোপীয় মহাসমরের অবসানে ভারতের তরুণেরা যখন রণভূমি হইতে শ্রান্ত কলেবর গৃহে ফিরিয়াছিল তখন একদল ব্রাহ্মণই না তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিতে নানা স্থানে সভা সমিতি করিয়াছিল! বৈদ্য কায়স্থ নবশাখ প্রভৃতি অব্রাহ্মণেরা যখন যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল তখন একদল ব্রাহ্মণই না এই আন্দোলনকে পণ্ড করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিল! সনাতন ধর্ম্মের নামে একদল ব্রাহ্মণই না ব্রাহ্মসমাজের সমাজ

রাষ্ট্র ধর্মনীতির পবিত্র আন্দোলনে বাধা দিয়া ছিল! আর্য্য সমাজ, কংগ্রেস, হিন্দু সভাকে একদল ব্রাহ্মণই না ধর্ম্ম দেশ ও সমাজের শত্রু বলিয়া এবং জগদ্বরেণ্য মহাত্মা গান্ধীকে ধর্ম্মহন্তা বলিয়া কটুক্তি করিয়াছে! তবে যে সব ব্রাহ্মণ সন্তান দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র সেবায় নিজেকে আহুতি দিতেছেন তাঁহারা কে? এক কথায় বলিতে গেলে তাঁহারা দৈত্য কুলের প্রহ্লাদ। ভারতের অব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব পুরুষের মহতী কীর্ত্তির কথা স্মরণ করিয়াই ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। প্রাচীন ভারতের জাতি গঠনে ব্রাহ্মণের সহিত তুলনায় ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের দানও নগণ্য নয়। ব্রাহ্মণ যেমন কয়েক খানি পুঁথি লিখিয়াছে, ক্ষত্রিয়ও ঠিক তেমনই রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে, বৈশ্যও ঠিক তেমনই কৃষি-গোপালন বাণিজ্য দ্বারা ভারতকে অতুল ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করিয়াছে এবং শূদ্রও ঠিক তেমনই সেবাধর্ম্মে জগৎকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে। ধরাপৃষ্ঠ হইতে কত শত গ্রন্থ বিলীন হইয়াছে, কত ব্রাহ্মণের নাম পর্য্যন্ত জগদ্বাসী বিস্মৃত হইয়াছে কিন্তু ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র ও ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সহস্র সহস্র বৎসর পরেও আর্য্যজাতির হৃদয়রাজ্যে দৃঢ় সিংহাসনে উজ্জ্বল হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ভারতের বৈশ্য শক্তি সমুদ্র মন্থন বা বহির্দ্দেশ বাণিজ্য করিয়া ভারতকে যে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর করিয়াছে তাহা কি আর্য্যজাতি এখনও ভুলিয়াছে? ভারতের অসংখ্য মঠ মন্দির স্তুপ নগর রাজপথ স্থাপত্য শিল্প সেবাব্রতী শূদ্রেরই কারুকার্য্যে প্রাচীনভারতের গৌরব সূচনা করিতেছে। কিন্তু পুঁথী লেখার ভার যাঁহাদের হাতে ছিল সেই সব ব্রাহ্মণ অন্য তিন বর্ণকে ক্ষুণ্ণ করিয়া পুরাণে, সংহিতায় গল্পে, হেঁয়ালীতে শুধু ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের পাদোদক মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণের জন্য মাহাত্ম্য ইত্যাদি লিখিয়া গিয়াছেন। ভগবানের বুকে ব্রাহ্মণ-ভৃগুর পদাঘাত, ব্রাহ্মণ-অগস্ত্যের সমুদ্র পান, ভগবানের এক নাম বিপ্রদাস ইত্যাদি অজস্র ব্রাহ্মণমহিমা প্রচার করিয়াছেন। এমন কি ব্রাহ্মণ-পরশুরাম তাঁহার ক্ষত্রিয়া মাতা রেনুকা দেবীকে এবং অসংখ্য ক্ষত্রিয় নরনারী ও শিশু-সন্তানকে হত্যা করিয়া অবতারত্ব পাইয়াছেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজপুত্র মানব-প্রেমিক গৌতমবুদ্ধ ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে অকথ্য ভাষায় গালি দেওয়া হইয়াছে। "বৌদ্ধালয়ং বিশেৎ যস্তু মহাপদ্যাপি বৈদ্বিজঃ। তসচ নিস্কৃতি নাস্তি প্রায়শ্চিত্ত শতৈরপি॥ (নারদ পুরাণ ১।১।১৫।৫০) অর্থাৎ মহাবিপদেও যদি কোন দ্বিজ বৌদ্ধ গৃহে প্রবেশ করে তবে শত শত প্রায়শ্চিত্তেও তাহার নিস্কৃতি নাই।" এত ভীতি প্রদর্শনেও যখন কোন ফল হইল না, যখন সমগ্র ভারত ও বহি-

ভারতকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রাস করিয়া ফেলিল তখন নিরুপায় হইয়া হিন্দু সমাজ বৌদ্ধ সমাজের সহিত আপোষ করিল। বুদ্ধকে তখন নবম অবতার করা হইল। ধ্যান-স্তিমিত বুদ্ধ মূর্ত্তিতে সর্প জড়াইয়া; বাঘ চর্ম্ম পরাইয়া, কানে ধুতুরার ফুল গুঁজিয়া শিবঠাকুর করা হইল; বৌদ্ধের পঞ্চশিলার মূর্ত্তিকে পঞ্চ দেবতা করা হইল; বৌদ্ধের সংঘ-বুদ্ধ-ধর্ম্ম এই তিন শরণোক্তিকে শ্রীক্ষেত্রের বৌদ্ধমন্দিরে কৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রামূর্ত্তিতে স্থাপন করা হইল; বৌদ্ধ উৎসব স্নানযাত্রা রথযাত্রা চৈত্র সংক্রান্তিকে হিন্দু পর্ব্বে পরিণত করা হইল; বৌদ্ধের ত্রিসন্ধ্যা উপসনা ব্রাহ্মণের সায়ং প্রাতঃ দ্বিসন্ধ্যার স্থান অধিকার করিল। এমন কি অবশেষে বৌদ্ধ শ্রমণ, অর্হত, ভিক্ষু ও মঠাধীশদিগের গলায় পৈতা দিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ পুরোহিত করা হইল এবং অসংখ্য বৌদ্ধ হিন্দুরূপে তাহাদের যজমান শ্রেণীভুক্ত হইল। এখানে বৌদ্ধদের পরাজয় নয়—জয় হইল। আজ ভারতের অধিকাংশ হিন্দুই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। ব্রাহ্মণ লিখিত গ্রন্থে ভারতের গৌরবময় যুগের ক্ষত্রিয় রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, যশোধর্ম্মদেব প্রভৃতিকে অব্রাহ্মণ শূদ্র নাম দিয়া হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। একদিকে যখন হিন্দু কুল-প্রদীপ ছত্রপতি শিবাজী যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া রায়গড় দুর্গে ক্ষত্রিয়াচারে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইতেছিলেন তখন একদল ব্রাহ্মণই তাঁহাকে হীন শূদ্র বলিয়া গালাগালি দিয়াছিলেন ও ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে প্রবল বাধা দিয়াছিলেন। অন্যদিকে মোগল বাদশাহকে খুসী করিবার জন্য ব্রাহ্মণই আল্লোপনিষৎ রচনা করিয়াছিলেন ও "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া মুসলমানের নাগড়াই জুতায় মাথা ঠেকাইয়াছিলেন।

প্রশান্ত হৃদয় ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিয়াই একদল পণ্ডিত নানারূপ পুরাণ ও পুঁথী লিখিয়া অখণ্ড হিন্দু সমাজকে নানা সম্প্রদায়ে খণ্ড খণ্ড বিভক্ত করিয়াছে ও ভেদবৈষম্যের কালানল সৃষ্টি করিয়াছে।

ব্রাহ্মণলিখিত পুরাণের দোহাই দিয়া শৈবগণ ঘোষণা করিতেছেন ১। শিবলিঙ্গং সমুৎসৃজ্য যজ্যতে চান্য দেবতাং। সনৃপঃ সহদেশেন রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥ (লিঙ্গ পুরাণ-উত্তরার্দ্ধ ১১।৩৫) অর্থাৎ যে রাজা রাজ্যে শিবলিঙ্গ ছাড়িয়া অন্য দেবতার পূজা করে, সে রাজা রাজ্য সহিত রৌরব নরকে গমন করে। ২। শিবভক্তো ন যে রাজা ভক্তোহন্যেষু সুরেষু যঃ। স্বপতিং যুবতীংত্যক্ত্বা যথা জারেষু রাজতে॥ (ঐ) অর্থাৎ শিবভক্ত না হইয়া রাজা অন্য দেবতার ভক্ত হইলে ঠিক যেন যুবতী স্ত্রী নিজের পতি ছাড়িয়া জারে আসক্ত

হয়। ৩। বিষ্ণু দর্শন মাত্রেন শিবদ্রোহঃ প্রজায়তে। শিবদ্রোহান্ন সন্দেহো নরকং যান্তি দারুণম্ ॥ তস্মাদ্বিষ্ণু নামানি না বক্তব্যং কদাচন। (পদ্মপুরাণ) অর্থাৎ বিষ্ণুবিগ্রহ দর্শন করিলে শিবের ক্রোধ হয়। শিবের ক্রোধে নিঃসন্দেহ দরুণ নরকে যাইতে হয়। অতএব কখনও বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিবে না। ৪। বিভূতির্যস্য নো ভালে নাঙ্গে রুদ্রাক্ষ ধারণম্। নাস্য শিবময়ী বাণী তং ত্যজেদধমং যথা। (শিবপুরাণ, বিন্ধ্যেশ্বরী সংহিতা ২৩) অর্থাৎ যাহার কপালে বিভূতি নাই, অঙ্গে রুদ্রাক্ষ নাই, জিহ্বায় শিব নাম নাই তাহাকে অধম বলিয়া পরিত্যাগ করিবে। ৫। ধিগ্‌ভস্মরহিতং ভালং ধিগ্‌গ্রামমশিবালয়ম্। ধিগ নীশার্চ্চনং জন্ম ধিগ্বিদ্যামশিবাশ্রয়াম্ ॥ (ঐ অধ্যায় ২৪) অর্থাৎ ভস্মরহিত কপালকে ধিক! শিবালয়শূন্য গ্রামকে ধিক! ঈশ্বরোপাসনা রহিত জন্মকে ধিক। শিবাশ্রয়শূন্য জ্ঞানকে ধিক! অন্যদিকে বৈষ্ণবেরা ঘোষণা করিতেছেন—৬। যেহার্চ্চয়ন্তি সুরানন্যান্ ত্বাং বিনা পুরুষোত্তম। তে পাষণ্ডত্বমাপন্নাঃ সর্ব্বলোকবিগর্হিতাঃ ॥ (পদ্মপুরাণ ৭৬।২৫৫।৫৮) অর্থাৎ হে পুরুষোত্তম! যাহারা আপনাকে ছাড়িয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে তাহারা পাষণ্ডতা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকে নিন্দিত হয়। ৭। ইতরেষাং তু দেবানামন্নং পুষ্পং জলং তথা। অস্পৃশ্যন্তু ভবেৎ সর্ব্বং নির্ম্মাল্যং সুরয়া সমম্। (ঐ ৩৩) অর্থাৎ অন্য দেবতার অন্ন, পুষ্প, জল নির্ম্মাল্যাদি স্পর্শ করিবে না কারণ উহা মদ্যের সমান। ৮। সকৃদেব হি যোহশ্নাতি ব্রাহ্মণো জ্ঞান দুর্ব্বলঃ। নির্ম্মাল্যং শঙ্করাদীনাং সচাণ্ডালো ভবেদ্ধ্রুবম ॥ (পদ্মপুরাণ, অ ২৫৫।৯৯) অর্থাৎ যদি জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ একবারও মহাদেবাদির নির্ম্মাল্য খায় তবে সে নিশ্চয়ই চাণ্ডাল হইবে। ৯। কল্পকোটি সহস্রাণি পচ্যন্তে নরকাগ্নিনা নির্ম্মাল্যং ভোদ্বিজশ্রেষ্ঠা রুদ্রাদীনাং দিবৌকসাম্ ॥ (ঐ ১০০) ১০। রক্ষো যক্ষ পিশাচান্নং মদ্যমাংস সমঃ স্মৃতম্। তদ্ ব্রাহ্মণেন ন ভোক্তব্যং দেবানাং ভুঞ্জতং হবিঃ ॥ (ঐ ১০১) অর্থাৎ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! রুদ্রাদি ও সূর্য্যের নির্ম্মাল্য ও রাক্ষস-যক্ষ-পিশাচের অন্ন মদ্যের তুল্য। ইহাতে সহস্রকোটি কল্পকাল নরকাগ্নিতে পুড়িতে হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণ তাহা ভোজন করিবে না, দেবতারা যজ্ঞের হবিই ভোজন করেন।"

এযুগের অনেক ব্রাহ্মণই অর্থলোভী, নিমন্ত্রণপ্রিয়, ভীরু বা মিথ্যাচারী বলিয়া নিন্দিত। কিন্তু দেখা যায় কি প্রাচীন কালে কি নবীন কালে একদল ব্রাহ্মণের এগুণটি সাধের সাথী। আজ যেমন নিমন্ত্রণ, বিদায় ও দক্ষিণার কথা

শুনিয়া ব্রাহ্মণ নাচিয়া উঠেন; অর্থলোভে কাহাকেও ক্ষত্রিয়ত্বের বা কাহাকেও বৈশ্যত্বের পাঁতি দিয়া টাকা হজম হইলেই সমাজের ভয়ে একদম অস্বীকার করিয়া ফেলেন; অর্থলোভে রাজবংশের ইতিহাস লিখিতে গিয়া অসম্ভবকে সুসম্ভব করিয়া তুলেন প্রাচীন কালেও ঠিক তাহাই ছিল। রাজবংশের জন্মবৃত্তান্ত অনেক সময়ই অচিন্তনীয় থাকে। রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদিতে একদল ব্রাহ্মণ মুদ্রালোভে কত রাজপুত্র ও রাজকন্যার জন্মবৃত্তান্তে অপ্রাকৃতিক রহস্য যোগ করিয়াছেন। লুচি-মণ্ডা-পায়স খাওয়ায় রামলক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নের উৎপত্তি; পিতা দশরথ কিন্তু তখন বৃদ্ধ; অগ্নিকুণ্ড হইতে দ্রৌপদীর উৎপত্তি; পদ্মফুল হইতে রাধার উৎপত্তি; অবিবাহিতা অবস্থায় আকাশে সূর্য্য হইতে কুন্তীর গর্ভে কর্ণ জন্মিল এবং বিবাহের পর যমরাজ হইতে যুধিষ্ঠির, পবন হইতে ভীম, ইন্দ্র হইতে অর্জ্জুনের জন্ম; ভূমি কর্ষণ করিতে গিয়া ডিম্বাকারে জনক রাজার সীতা প্রাপ্তি। সগর রাজার স্ত্রী সুমতী এক চর্ম্মের লাউ প্রসব করিলেন, রাজা তখন "কোপে লাউ ভাঙিয়া করিল খান খান। ষাটি হাজার পুত্র হৈল তিল প্রমাণ ॥ যবে সগর রাজা হাতে মারে ছুড়ি। ষাটি হাজার কোলে আসি দিয়া হামা গুড়ি ॥" (কৃত্তিবাসের রামায়ণ)। শুধু তাহাই নয়, ভগীরথ সম্বন্ধে লিখিত হইল "ভগে ভগে জন্ম হেতু ভগীরথ হৈল" (ঐ)। বলরামের পিতা বসুদেব সদ্যোবিবাহিতা পত্নী দেবকীর সহিত কংসের কারাগারে বন্দী হইলেন। অন্য পত্নী রোহিণী কংসের ভয়ে গোকুলে নন্দের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। স্বামী ৬।৭ বৎসর যমুনার অপর পারে মথুরায় বন্দী কিন্তু রোহিনী বলরামকে প্রসব করিলেন। ভাগবতে লিখিত হইল কংসের কারাগারে সপত্নী আসিয়া রোহিনীর পেটের মধ্যে ঢুকিয়াছিল। ব্রাহ্মণ কলমের খোঁচায় জাতি ও সম্প্রদায় বিদ্বেষ প্রচার করিয়াও ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণ কবি বাল্মিকীমুনি চৌর্য্য দস্যুতা ত্যাগ করিয়া হঠাৎ সাধু হইয়াই নানাজাতিকে পশু পক্ষী বানর রূপে রামায়ণে অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড পড়িলে জানা যায় বানরগণ অতি সুসভ্য মানুষ ছিলেন। তাঁহাদের শব দাহ হইত, গৃহে বেদ বেদাঙ্গ পাঠ হইত, তাঁহারা বিরাট হর্ম্ম্য সৌধ অট্টালিকায় বাস করিতেন, বীণাদি বাদ্যযন্ত্রে সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেন, রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। হনুমান ছিলেন সেনাপতি, নল ও নীল ছিলেন শিল্পী, সুগ্রীব-অঙ্গদ ছিলেন রাজপুত্রও রামের হিতৈষী বন্ধু কিন্তু তাঁহাদিগকে বর্ণনা করা হইল লাঙ্গুল ধারী বানর রূপে। ঋক্ষরাজ জাম্ববান ছিলেন রামচন্দ্রের

প্রধান মন্ত্রী এবং জটায়ু ছিলেন দশরথের ব্যোমমার্গীবন্ধু। কিন্তু তাহাদিগকে জম্বুক এবং পক্ষীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সর্প পশু পক্ষীর উপাধি মানুষ সব সময়েই গ্রহণ করে। এখনও অনেকে সিংহ বাঘ হাতী নাগ গিরি ময়ূর প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করেন এজন্য তাঁহারা জীবজন্তু পক্ষী সর্পাদির আকার গ্রহণ করেন নাই! ব্রাহ্মণ-লেখক এই ভাবেই সুবিধা বুঝিয়া এক এক খানি গ্রন্থ লিখিয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত অনেককেই সঙ্কর জারজ শূদ্র অন্ত্যজ ব্রাত্য হীন নীচ অস্পৃশ্য আদি উপাধি দান করিয়াছেন।

কুসংস্কার প্রচার করিয়াও ব্রাহ্মণ দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কারাগারে শৃঙ্খল শুধু বাহিরেই বাঁধিয়া রাখে এবং সুযোগ ঘটিলেই মুক্ত হওয়া যায় কিন্তু সামাজিক কুসংস্কারের শৃঙ্খল মানুষকে ভিতরে বাহিরে, শরীরে মনে, ইহকালে, পরকালে বংশ পরম্পরায় বাঁধিয়া রাখে। ব্রাহ্মণ অসংখ্য পুঁথী লিখিয়া অসংখ্য নিরীহ সরল ধর্ম্মভীরু দেশবাসীকে কুসংস্কারের নাগপাশে বন্ধন করিয়াছে। কারাগারের বন্দীর জন্য প্রহরীর প্রয়োজন হয় কিন্তু কুসংস্কারের বন্দী স্বয়ং স্বেচ্ছায় সানন্দে শৃঙ্খলিত থাকে। ব্রাহ্মণ রচিত কুসংস্কারের প্রথম লীলা ব্রাহ্মণ শূদ্রের পার্থক্য-স্থাপন। একদিকে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন অন্যদিকে শূদ্রের মিথ্যা হীনতার ঘোষণা। ব্রাহ্মণ ভগবানের প্রাইভেট সেক্রেটারী, তাহার সহিত পরামর্শ করিয়াই ভগবানের সমস্ত কার্য্য চলে। তাই ভগবানের পূজা অর্চ্চনা স্নান আহার নিদ্রা জাগরণ সব ব্রাহ্মণেরই হাতে। অন্যদিকে শূদ্রের পক্ষে ভগবানকে ডাকিবারই অধিকার নাই! ব্রাহ্মণের চরণ পূজা, চরণামৃত পান করা, পদরজ সর্ব্বাঙ্গে লেপন করা, ব্রাহ্মণ ভোজন দেওয়া ও দক্ষিণা দান করাই শূদ্রের পক্ষে একমাত্র ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ অজ্ঞ শূদ্রের প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া এই সরল ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আজও কোটি কোটি অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত-সুশিক্ষিত শূদ্র নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। ইহাই হইল ব্রাহ্মণ রচিত প্রথম শৃঙ্খল বা লুণ্ঠনের প্রথম পথ। দ্বিতীয়ত, পুরাণ উপপুরাণে ব্রাহ্মণ নানারূপ দেবদেবীর কল্পনা করিয়া অসংখ্য অলৌকিক কল্পিত মিথ্যা উপাখ্যান প্রচার করিলেন এবং সেই কল্পিত দেবতার পূজার বিধিও আবিষ্কার করিলেন। কোটি কোটি শূদ্রকে মূর্ত্তি ও প্রতিমা পূজক বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়া মুষ্টিমেয় পুরোহিত ব্রাহ্মণ পূজার চাবিকাঠি নিজেদের হাতে রাখিয়া মজা লুটিতে লাগিলেন। সুবিধা প্রিয় দেশবাসী স্বর্গে পৌঁছিবার সোজা পথ (Short Cut) পাইয়া মূর্ত্তিপূজা না করিয়াও মূর্ত্তিপূজক

বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে লাগিল। এইরূপে শত সহস্র লোকে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রাধান্য স্থাপন করিল। প্রতিমা পূজায় কত আমোদ প্রমোদ, মজা তামাসা সাজসরঞ্জাম আয়োজনের ঘটা! কত ঝাড়লণ্ঠন, দীপমালা, আতসবাজী, লুচিসন্দেশ মোহনভোগ নৈবেদ্যের ধূম! কত ছাগ-মহিষ-ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ঘি মশলার ছড়াছড়ি! কত ঢাক ঢোল যাত্রা খেমটা বেশ্যা নাচ মদ গাঁজা মন্ত্রপাঠের রৈ রৈ কাণ্ড! কত ভিখারী কাঙ্গালী আত্মীয় কুটুম্ব অর্থ প্রাচুর্য্য প্রদর্শন! এত মজা ছাড়িয়া কোন্ "বেয়াকুব" মনে মনে ঈশ্বর চিন্তা করিবে? সুতরাং দেশবাসী নব আবিষ্কৃত মজাদার উপাসনা প্রণালী গ্রহণ করিয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণের শ্রীচরণে আত্মবিক্রয় করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিল। কোটি কোটি নরনারী এখনও বুঝিতে পারিতেছে না মূর্ত্তিপূজার রহস্য কোথায়। দেশের অসংখ্য প্রাণহীন মূঢ় ম্লান শূদ্র-যজমানের প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য পুরোহিত ব্রাহ্মণ ব্যস্ত নয়। তিনি ব্যস্ত যজমানের বাড়ীর প্রস্তর বা মৃন্ময় মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠায়। পুরোহিতের সদ্যোমৃত মাতাপিতার শবদেহেও এসব মন্ত্র কার্য্যকরী হয় না। পুরোহিতের যত মন্ত্র মাহাত্ম্য খাটে যজমানের বাড়ীতে প্রস্তর মৃত্তিকার উপর। আজ যদি যজমান পূজার দক্ষিণা বন্ধ করিয়া দেয় তবে পুরোহিত ঠাকুরেরাও একে একে সাকার উপাসনার পণ্ড শ্রম ত্যাগ করিবে। মূর্ত্তিপূজারই নামান্তর পুরোহিতের পেটপূজা। ইহাই ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় শৃঙ্খল বা লুণ্ঠনের দ্বিতীয় পথ। তৃতীয়তঃ, মৃতক শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা। যজমানের বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মৃত্যুতেই পুরোহিতের বেশি লাভ। এক একটি যজমান মরিলে চৌদ্দ-পুরুষের নামে পিণ্ডের ট্যাক্স আদায় হইবে। প্রেতলোকে খাদ্য দ্রব্য খাট পালঙ্ক মশারী গরু বাছুর পাঠাইবার নাম করিয়া সবই পুরোহিতের নিজের ঘরে চলিয়া আসে। রাজার ট্যাক্স দেওয়া মরিবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু পুরোহিতের ট্যাক্স মরিবার পরেও মৃত চৌদ্দ পুরুষের নাম চৌদ্দগুণ বৃদ্ধি পায়। পুরোহিত শুভকার্য্যেও লণ্ডন করে অশুভ কার্য্যেও লুণ্ঠন করে। বিবাহ অন্নপ্রাশনাদি শুভকার্য্যে যজমান আনন্দে উৎফুল্ল থাকে, ইন্দ্রিয় সতেজ থাকে, তখন, লুণ্ঠন তত সুবিধাজনক হয় না। শ্রাদ্ধাদি অশুভ কার্য্যে যজমান শোকে মুহ্যমান থাকে; ইন্দ্রিয়াদি শিথিল থাকে, পুরোহিত এই সুযোগে যজমানকে প্রেত লোক ও নরকখানার ভয় দেখাইয়া নানারূপ পাশবিক চাপ দিয়া অর্থ নিষ্কাসন করে। কত গৃহস্থ শ্রাদ্ধকার্য্যে মৃতককে উদ্ধার করিতে পুরোহিতের

মায়াজালে পড়িয়া নিজেই উদ্ধার হইয়া যায়। সঙ্গতি সম্পন্ন কত গৃহস্থ শ্রাদ্ধের ব্যয় বাহুল্যে ঋণের দায়ে ধ্বংসমুখে পতিত হয় আর উঠিতে পারে না। এই শ্রাদ্ধই ব্রাহ্মণের হাতে কুসংস্কারের তৃতীয় শৃঙ্খল বা লুণ্ঠনের ৩য় পথ। চতুর্থতঃ ব্রাহ্মণ নানাস্থানে তীর্থ মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া পাণ্ডা পুরোহিত রূপে অসংখ্য নিরন্ন বুভুক্ষু নরনারীকে শোষণ করিতেছে। পাণ্ডা পুরোহিত ভগবানের দালাল রূপে সস্তায় স্বর্গ দানের লোভ দেখাইয়া যে অর্থ লুণ্ঠন করে কিন্তু তাহা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা দীক্ষায় ব্যয়িত না হইয়া তাহাদের ভোগে সুখে বিলাসেই নিঃশেষ হইয়া যায়। পূর্ব্বে তীর্থস্থান ছিল সাধু মহাপুরুষ ভক্ত, জ্ঞানী ও কর্মীর নিবাসস্থান। বর্ত্তমানে দেশের বেকার সমস্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন তীর্থস্থান আবিষ্কৃত হইতেছে এবং গুণ্ডা ষণ্ডা পাণ্ডায় সেগুলি পরিপূর্ণ হইতেছে। এই তীর্থই ব্রাহ্মণের হাতে কুসংস্কারের চতুর্থ শৃঙ্খল বা লুণ্ঠনের চতুর্থ পথ। পঞ্চমতঃ ব্রাহ্মণ ফলিত জ্যোতিষ, রাহুকেতু শনির অশুভ দৃষ্টি, কবচ ধারণের সুফল, হাঁচি টিকটিকির কুফল ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়া কুসংস্কারের মহারণ্য সৃষ্টি করিয়াছে। জন্ম পত্রিকাই আজ হিন্দুর মৃত্যু-পত্রিকায় পরিণত হইয়াছে। হিন্দুর গণিত জ্যোতিষ জগতের নিকট আদরের বস্তু কিন্তু ফলিত জ্যোতিষের কুসংস্কার প্রত্যেক তিথিতে হিন্দুজাতির হাড় মাংস চর্ব্বণ করিতেছে। ইহা ব্রাহ্মণের হাতে কুসংস্কারের পঞ্চম শৃঙ্খল বা লুণ্ঠনের পঞ্চম পথ; ষষ্ঠতঃ ব্রাহ্মণ গোঁসাই প্রভুপাদেরা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের নামে ধর্ম্মভীরু সরল হিন্দু নরনারীর মধ্যে রাসলীলা, বস্ত্রহরণ প্রভৃতির অপ-ব্যাখ্যা করিয়া অসংযত নরনারীর মনে রুচি বিকার জন্মাইতেছে ও ধনরত্ন মন প্রাণ সবই লুণ্ঠন করিতেছে। এই অন্নবস্ত্র সমস্যার দিনে ভাগবত পাঠের ন্যায় অর্থাগমের সুগম পথ আর নাই। ইহাই ব্রাহ্মণের হাতে কুসংস্কারের ষষ্ঠ শৃঙ্খল বা লুণ্ঠনের ষষ্ঠ পথ।

এই জন্যই সংস্কার আন্দোলন দেখিয়া ব্রাহ্মণের প্রাণ চিরদিনই উড়িয়া যায়। শূদ্র ও পশুজাতির প্রতি ব্রাহ্মণের নিপীড়ন নির্যাতন অত্যাচার যখন ভারতের আকাশ বাতাসকে বিষাক্ত করিয়া তুলিল তখন আসিলেন গৌতম বুদ্ধ। তাঁহার প্রেম ও অহিংসার মারুত হিল্লোলে দলিত শূদ্র জাতি আত্মরক্ষা করিল। তিনি ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে সমান অধিকার দিলেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ ১৫০০ বৎসর বুদ্ধের প্রেম ধর্ম্মের প্লাবন ভারতকে ভাসাইয়া চীন জাপান দ্বীপদ্বীপান্তরেও গিয়া পৌঁছিল। ভারতে

তখন একাকার, ব্রাহ্মণের অনাচার, নরবলি, পশুবলি, জাতিহিংসা তিরোহিত হইয়াছে; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের আভিজাত্য ও অত্যাচার বিলুপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া তখন শূদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। যে দুই চারিজন জাতিগত অভিজাত ব্রাহ্মণ ভারতের এখানে সেখানে ভ্রমণ করিতেছিল তাহারই কাপালিক; সৌগত, ক্ষপণক, শৈব, শাক্ত, তান্ত্রিক গাণপত্য; মল্লারী দণ্ডী, বামাচারী, গারুড় সৌর, ভাগবত, পাশুপত নৈর্গন্থ্য, অঘোরী ও ভৈরবের বেশে বহুরূপী হইয়া পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ করিল। বৌদ্ধগণ তাহাদের ছলনায় মুগ্ধ হইয়া ব্যাভিচারী মদ্য মাংসাহারী নরঘাতক রূপে পরিণত হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ ঘটিল। ঠিক এইরূপেই এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বাংলাদেশে প্রেমাবতার গৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। মুসলমান কাজী ও বাদশাহের অত্যাচারে যখন চৈতন্যদেব জর্জ্জরিত তখন তিনি প্রকৃত ভক্ত মাতা ৩॥ জন পাইয়াছিলেন। জগাই মাধাই-এর মত শত শত নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ তখন চৈতন্যের উপর অত্যাচার চালাইয়াছিল। শচীদেবীকে একঘরে পর্য্যন্ত করিয়াছিল। কিন্তু যখন মুসলমান রাজত্ব লোপ পাইল, কাজীর অত্যাচার নিঃশেষ হইল, বৈষ্ণব ধর্ম্ম যখন জমিয়া উঠিল তখন চৈতন্যদেবের নামে ব্যবসা খুলিতে ঘাটে, পথে প্রভুপাদ গোস্বামী গজাইয়া উঠিতে লাগিল। ঘর হইতে কেহ শ্রীগৌরাঙ্গের কন্থা, কেহ যষ্টি কেহ কাষ্ঠ পাদুকা কেহ তুলসী মালা বাহির করিতে লাগিলেন; কেহ অদ্বৈত পরিবার, কেহ নিত্যানন্দ বংশ, কেহ শ্রীবাসের গোষ্ঠী এইভাবে বৈষ্ণবের মধ্যেও কৌলিন্য আভিজাত্য ও বনিয়াদি বংশের মহিমা কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের নামে ঈশ্বরোপাসনা ত্যাগ করিয়া মানুষপূজা ও কর্ত্তাভজার দল সৃষ্ট হইল—গৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম রসাতলে গেল। এখন কতকগুলি আরামপ্রিয়, ভীরু স্বার্থপর ব্যবসায়ীর হাতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম। ঠিক এইরূপে তখন ব্রাহ্মণ ঢুকিয়া বৌদ্ধধর্ম্মেরও সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ কীট প্রবেশ করিয়া সব আন্দোলনকেই এইরূপ পণ্ড করে। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের উপর অত্যাচারকারী নবদ্বীপে ব্রাহ্মণদের মধ্যে তখন অনেকে গোমাংসও সেবায় লাগাইতেন যথা ব্রাহ্মণ হইয়া করে গোমাংস ভক্ষণ। ডাকাচুরি পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ। (চৈতন্য ভাগবত)। সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কার আন্দোলনে এই শ্রেণীর লোকেই চিরদিন বাধা দিয়া থাকে।

বৌদ্ধযুগের ঠিক শেষ ভাগে ভারতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ মহাপুরুষের

আবির্ভাব হয়। তাঁহারা সেই সব বিকৃত বৌদ্ধকে দলে দলে যজ্ঞোপবীত দান করিয়া ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন। যাহারা ছিল বেদবিদ্যাহীন বৌদ্ধ তাহারাই পৈতাগ্রহণ করিয়া পরে বেদবিদ্যাহীন ব্রাহ্মণে পরিণত হইল। বর্ত্তমানের ব্রাহ্মণের অধিকাংশই যে বেদজ্ঞহীন ইহাই তাহার একামাত্র কারণ। ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরাই বেদজ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিয়া বৌদ্ধ সাজিয়াছিলেন। পৈতা লইয়া তাঁহারা পুনরায় ব্রাহ্মণ সাজিলেন বটে কিন্তু বেদকে আর গ্রহণ করিলেন না। ইহারা বৌদ্ধযুগের সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম এই তিন পিটক গ্রন্থ বন্ধ করিয়া তন্ত্রের নাম দিয়া অসংখ্য গ্রন্থ লিখিয়া প্রচার করিলেন। ইহার মধ্যে রুদ্রযামল, শ্যামারহস্য, নীলতোড়ল, শাক্তানন্দ, মহানির্ব্বাণ, শারদা, ত্রিপুরাসার, মহাচীনাচার, মন্ত্রমহোদধি, রাধা, বৃহন্নীল, মাতৃকাভেদ, কুলার্ণব, যোগিনী, মন্ত্রকোষ, গুপ্তসাধন, ফেৎকারিণী, উড্ডামরেশ্বর, কুমারীধিকা, বিশ্বসার কামাখ্যা, কঙ্কাল-মালিনী প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ যুগের শেষভাগে উত্তর ভারতের এক ভীষণ দুর্ভিক্ষের দিনে গোমতী তীরে নৈমিষারণ্যে অতিথিশালা বা অন্নসত্র খুলিয়া সারস্বত মুনি ৬০০০০ ষষ্ঠি সহস্র বৌদ্ধকে অন্নদান করিয়া যজ্ঞোপবীত দিয়া বেদ পড়াইয়া ব্রাহ্মণ করিয়া লইলেন। (মহাভারত গদা পর্ব্ব ২২-৪ ; ৮-৪১) শুধু ভারতেই নয় মহর্ষি কর্ণের প্রচেষ্টায় মিশরের ম্লেচ্ছগণও শুদ্ধ হইয়া বেদ পাঠ করিয়া শিখা সূত্র ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। "মিশ্রদেশোদ্ভবা ম্লেচ্ছো কাশ্যপেন সুশাসিতাঃ। সংস্কৃতাঃ শূদ্রবর্ণাশ্চ ব্রহ্মবর্ণ-মুপাগতা॥ শিখাসূত্রে সমাধায় পঠিত্ব বেদমুত্তমম্। (ভবিষ্য পুরাণ, প্রতি সর্গ ৪।২১)। আচার্য্য শঙ্কর অগ্নিবংশজ ক্ষত্রিয় রাজাদের সাহায্যে দশকোটি বিকৃত বৌদ্ধকে শঙ্খধ্বনি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া পুনরায় বৈদিকধর্ম্মে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ শঙ্খধ্বনি করিয়া ও বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া যাইতেন। যতদূর পর্যন্ত শঙ্খধ্বনি পৌঁছিত ততদূর পর্যন্ত শুদ্ধ হইল বলিয়া ঘোষণা করা হইত। দলে দলে লোক আসিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিত ও নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিত। গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, কৃষ্ণা, গোদাবরী, তাপ্তী নদীতে ডুব দিয়া সহস্র লোক যজ্ঞোপবীত গলায় দিয়া গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইত ও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিত। শঙ্কর বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে দাক্ষিণাত্যে অসংখ্য ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব নষ্ট হইল না।

শঙ্করাচার্য্য বা কুমারি ভট্টরূহেই বঙ্গদেশে পদার্পণ করিলেন না সুতরাং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পতাকা এখানে সমভাবেই উড্ডীন রহিল।

বঙ্গে ব্রাহ্মণের বংশবৃদ্ধি

বহু প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গে ব্রাহ্মণের আগমন হইয়াছে। প্রাচীনকালে ভারতের চতুঃপার্শ্বে বহুদূর পর্যন্ত হিন্দুরাজ্য বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমানকালের আফগানিস্থানই অতীত কালের গান্ধার রাজ্য। গান্ধার রাজকুমারী গান্ধারীই ছিলেন কুরুরাজ দুর্যোধনের জননী। গান্ধার ও পারস্য রাজ্যের সহিত ভারতের তখন অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। পারস্য রাজ বহ্রাম গৌড় খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে সুদূর পারস্য হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া কান্যকুব্জের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তাহা হইতেই গৌড়রাজপুত গণের উৎপত্তি। বহ্রাম গৌড়ের বংশধরেরাই আফগান রাজ্যে গৌড়বংশ স্থাপন করেন। (টডের রাজস্থান ১ম, খণ্ড ২৩২ পৃঃ ও ২য় খণ্ড ৪৪৯ পৃঃ)। তাঁহারা ছিলেন আর্য্য হিন্দু। গৌড় বংশই পরে গৌড়, ঘোর বা ঘোরী বংশ নামে খ্যাত। মুসলমান বিজয়ের পর গৌড় বা ঘোরী বংশ মুসলিমধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এইবংশেই মহম্মদ ঘোরীর জন্ম। গৌড়বংশীয় রাজপুতেরা সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহাদের নাম অনুসারেই বঙ্গের কিয়দংশের প্রাচীন নাম হইয়াছিল গৌড় দেশ। ক্ষত্রিয় গৌড়দের সহিত যে সব পুরোহিত ছিলেন তাঁহারাই পরে গৌড়ের ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। বৌদ্ধপ্লাবনে তাঁহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। ইহা ছাড়া বঙ্গের অন্য একদল গৌড়াদ্যবৈদিকব্রাহ্মণ বৌদ্ধ প্লাবনের সময় নিষ্প্রভ অবস্থায় কাল কাটাইতেছিলেন। বৌদ্ধযুগে বঙ্গদেশে কয়েক কিস্তিতে ব্রাহ্মণ আগমন করেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বঙ্গাধিপতি রাজা শশাঙ্ক কান্যকুব্জের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় যাগযজ্ঞ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কামনায় পশ্চিম ভারত হইতে একদল ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। পরে তাঁহারাই গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত হন। গৌড়াধিপতি মদনপালের সেনাপতি শূরসেন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজ্যস্থাপন করেন। ইঁহারই অন্য নাম জয়ন্ত বা আদিশূর। ইঁহার পিতার নাম ছিল মাধবশূর। ইঁনি বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শৈব হইয়াছিলেন এবং

যাগযজ্ঞাদির জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের ইঁহারাই পূর্ব্বপুরুষ। কানাকুব্জ হইতে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত ও বিতণ্ডা। আগমনের তারিখ সম্বন্ধে নানামত। গৌড়ে ব্রাহ্মণ রচয়িতার মতে ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে, সম্বন্ধ নির্ণয়ের মতে ৯৪২ খৃঃ, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ৯৬৪ খৃষ্টাব্দে, দত্ত বংশমালার মতে ৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভট্ট গ্রন্থমতে ১০৭২ খৃষ্টাব্দে, বাচস্পতি মিশ্রের মতে ৭৩২ খৃষ্টাব্দে এবং কুলার্ণবের মতে ৯৩২ খৃষ্টাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করেন, কিন্তু ভিতরে কি রহস্য আছে জানা মুস্কিল। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম সম্বন্ধেও নানা গোলমাল। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের মধ্যেই নানা মত। বাচস্পতি মিশ্র প্রমুখ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য বলেন শাণ্ডিল্য গোত্রের কবি ভট্ট নারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রজ দক্ষ, বাৎস্য গোত্রজ ছান্দজ ভরদ্বাজ গোত্রজ হর্ষ এবং সাবর্ণ গোত্রজ বেদগর্ভ এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ অশ্বারোহণে কোলঞ্চ দেশ হইতে জলদগ্নিবত্ আদিশূরের সভায় আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ কবচাবৃত ও করে রমণীয় অসিবান তূণ শোভিত ছিল। (বাচস্পতি মিশ্রের কুল রমা)। কিন্তু বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণের মতে শাণ্ডিল্য গোত্রজ নারায়ণ, বাৎস্য গোত্রজ ধরাধর, কাশ্যপ গোত্রজ সুষেণ, ভরদ্বাজ গোত্রজ গৌতম এবং সাবর্ণ গোত্রজ পরাশর আগমন করিয়াছিলেন। (বারেন্দ্র কুল পঞ্জিকা)। কিন্তু এড়ুমিশ্র, হরিমিশ্র দেবীবর ও মহেশ প্রভৃতি প্রাচীন কুলজ্ঞদের মতে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি বা তিথিমেধা বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যাঁহারা অব্রাহ্মণ সমাজের বংশাবলীকে কতভাবে চিত্রিত করেন তাঁহারাই পূর্ব্বপুরুষের নাম ও গোত্র বর্ণনা করিতে গিয়া গোলমাল করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কারণ কি? পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন স্থান লইয়াও নানা মত। সম্বন্ধ নির্ণয় রচয়িতা বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন পঞ্চ ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরের রাজধানীতে আগমন করেন, "আদিশূর ও বল্লালসেন" প্রণেতা পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় বলেন বিক্রমপুরান্তর্গত মেঘনা নদীর পূর্ব্ব উপকূলে রামপাল নামক স্থানেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন স্থান। তাঁহারা কিভাবে আসিয়াছিলেন এ সম্বন্ধেও নানা মত। কেহ বলেন অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ বলেন গজপৃষ্ঠে এবং কেহ বলে গো-যানে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন করেন।

যাহাই হউক, পঞ্চম ব্রাহ্মণ যে আসিয়াছিলেন ও তাঁহারাই যে বর্ত্তমানের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ এ বিষয়ে সকলেই একমত। অনেকে

কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনিবার গল্পকে সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া মনে করেন। মহম্মদ গজনবী ১০১৮ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জ লুণ্ঠন করে, মন্দিরাদি ধ্বংস করে এবং আরও নানারূপে অত্যাচার করে। তখন কতকগুলি ব্রাহ্মণ পলাইয়া বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। অনেকের মতে এই সব ব্রাহ্মণই বর্ত্তমান রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষ। আদিশূর কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা (যশোবর্ম্ম-দেবের পালিতা কন্যা) চন্দ্রমুখীর পাণিগ্রহণ করেন। আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন করিলেন কিন্তু বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে পাওয়া দুষ্কর হইল। রাণীর অভিলাষ অনুসারে তিনি কান্যকুব্জের রাজা বীর সিংহের নিকট কয়েকজন ব্রাহ্মণের জন্য বলাহক নামক দূত প্রেরণ করেন। ধ্রুবানন্দের গৌড় বংশাবলীতে আছে—রাজা লিখিতেছেন "বঙ্গদেশে ন বিপ্রোঃসন্তি বেদজ্ঞ যজ্ঞ-কারকঃ। পরাশরাণিকাঃ সন্তি কথং যজ্ঞঃ ভবিষ্যতি॥ বঙ্গদেশে যজ্ঞ করিতে পারে এমন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নাই, পরাশর অনিক নামক ব্রাহ্মণের আছে। যজ্ঞ হইবে কেমন করিয়া? কান্যকুব্জ রাজের ভাট দূতকে বলিতেছেন—'পতিতঃ বঙ্গ-দেশস্তু ন শ্রুতং কিং ত্বয়া কচিৎ? তীর্থ যাত্রা বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কার মর্হতি।" হে দূত! বঙ্গদেশ যে পতিত তাহা কি তুমি জান না? সেখানে তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। "অতো বঙ্গাখ্য-দেশেতু গমিষ্যন্তি ন বৈদ্বিজাঃ। কথয়িষ্যসি ভূপালং তস্যেয়ং প্রার্থনা বৃথা॥" সুতরাং বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ যাইবে না। রাজাকে গিয়া বল তাঁহার এ প্রার্থনা বৃথা।" আদিশূর এই উত্তর শুনিয়া সেনাপতি বীরবাহুকে সসৈন্যে কান্যকুব্জ আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন, বীরবাহু যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। এই যুদ্ধে কাশীরাজ বীরসিংহকে সাহায্য করেন। আদিশূর নিরুপায় দেখিয়া ইংরাজের মণিপুর দখলের মতো এক ফন্দি আঁটিলেন। তিনি শত শত 'অস্পৃশ্য' 'হীনবংশ সম্ভব' লোককে গলায় পৈতা দিয়া ব্রাহ্মণ সাজাইয়া ধনুর্ব্বাণ হাতে গো যানে সমর ভূমিতে পাঠাইলেন। "ততঃ সপ্তশতাঃ বঙ্গা অস্পৃশ্যা হীনসম্ভবাঃ। বিপ্রবেশং সমাস্থায় গবারূঢ়াঃ ধনুর্দ্ধরাঃ॥ নৃপাদেশেন তে সর্ব্বে নানা সজ্জা সমন্বিতাঃ। অজস্মুঃসমরং কর্ত্তুং সিংহনাদৈ রণাজিরে॥ (ধ্রুবানন্দ মিশ্রকারিকা)। গো ব্রাহ্মণ ভক্ত রাজা বীরসিংহ গো-ব্রাহ্মণ বধের আশঙ্কায় পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া সন্ধি করেন। বীরসিংহ এই শত শত গবারূঢ় ব্রাহ্মণবেশী সৈনিককে বর দিয়াছিলেন। "বরং সপ্তশতেভ্যোহসৌ সৈনিকেভ্যো দদৌমুদা॥ ভবন্তু ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে সত্যং সত্যং মমাজ্ঞয়া। সপ্ত সতীতি বিখ্যাতাস্তহলিকা প্রভবন্

ত্মা॥" (মিশ্রকারিকা)। অর্থাৎ এই সাত শত সৈনিককে তিনি বর দিলেন—আমার আজ্ঞায় তোমরা ব্রাহ্মণ হও। তাঁহারা সপ্তসতী নামে বিখ্যাত হইলেন।" এইরূপে কান্যকুব্জরাজের ক্ষত্রিয় রাজার বরে এই 'অস্পৃশ্য' সপ্ত শত সৈনিক ব্রাহ্মণত্বে প্রমোশন পাইলেন ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইলেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে আসিয়াছিলেন পাঁচজন কায়স্থ—দাশরথি বসু, মকরন্দ ঘোষ, বিরাট গুহ, কালিদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম দত্ত। সপ্তশত সৈনিক বঙ্গদেশে ফিরিয়া গো-পৃষ্ঠে আরোহণজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কিন্তু তাহাদের জ্ঞাতিরা তাঁহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিলেন না। রাজা তাহাদিগকে ২৮ খানি গ্রাম উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। তাঁহারা সপ্তশতী নামে এক পৃথক সমাজরূপে বাস করিতে লাগিলেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণ যজ্ঞ সমাপনান্তে কান্যকুব্জে প্রত্যাগমন করিলে পতিত দেশে গমন হেতু পাতিত্য ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্বেরা সমাজে গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা ভগ্নমনোরথ হইয়া পুনরায় বঙ্গদেশ আগমন করেন। বঙ্গদেশে ইহারা সপ্তশতীর কন্যা বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করিতে লাগিলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর ইহাদের কান্য কুব্জ-বাসী বংশধরেরা শ্রাদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে জ্ঞাতিগণ কেহই সে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারাও এই সব মনদুঃখে বঙ্গদেশে আগমন করেন ও সপ্তশতীর গৃহে বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়া বংশবৃদ্ধি করিতে থাকেন।

বল্লাল চরিতকার লিখিতেছেন 'তৈরূঢ়া নৃপতের্বাক্যাৎ সপ্ত সপ্ত-শতাত্মজাঃ। তৈর্দৈবশতো জাতাস্তাসু সপ্ত সুতা বনা। বরেন্দং গতা পঞ্চ কনিষ্ঠৌ রাঢ় সংস্থিতো॥ (পূর্ব্ব খণ্ড ২২।২৩) অর্থাৎ সাতজন ব্রাহ্মণ রাজার কথায় ৭টি সপ্তশতীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। দৈবযোগে তাঁহার ৭টি পুত্র জন্মিল, ইহাদের ৫জন বরেন্দ্র দেশে ও ২জন রাঢ়দেশে বাস করিলেন। কিন্তু 'সম্বন্ধ নির্ণয়' প্রণেতা বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ রাজদত্ত পাঁচ খানি গ্রাম লইয়া পরমানন্দে কাল কাটাইতেছিলেন। কালক্রমে তাঁহাদের ৫৬টি সন্তান জন্মিল। তাহাদের বংশধরদের মধ্যে যখন অন্তর্বিবাদ ঘটিল তখন একদল গঙ্গার নিকটবর্ত্তী রাঢ়দেশে এবং অন্যদল পদ্মার নিকটবর্ত্তী বারেন্দ্র দেশে বাস করিতে লাগিলেন। এই হইতেই প্রথম দলের নাম রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও দ্বিতীয় দলের নাম বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হইল। ভট্ট নারায়ণ, দক্ষ; ছাড়, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভ এই পঞ্চ ব্রাহ্মণই বর্ত্তমান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব পুরুষ। রাঢ়

দেশের রাজা ভূসুরের পুত্র মহারাজ ক্ষিতিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণের ঔরসজাত ৫৬ জন ব্রাহ্মণকে ৫৬ খানি গ্রাম দান করেন। রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এই গ্রামের নামানুসারেই ৫৬ গাঁঞি প্রচলিত হয় এবং গ্রামের নামানুসারেই তাঁহাদের বন্দ্য, গড়গড়, দীঘড়া, ঝিকর, মুখটি, চাটুতি, ঘোষাল, গুড় সিমলা, বটব্যাল, পর্কট, পীতমুণ্ড, কাঞ্জিলাল, গাঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধি হয়। দিনাজপুরের জমিদার কংসা নারায়ণ বঙ্গের পাঠান নবাবকে নিহত করিয়া ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হন। ইনিই আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সর্ব্বপ্রথম দুর্গোৎসব করেন। পরে ধনীদের মধ্যে এই উৎসব চলিতে থাকে। কংসনারায়ণের কায়স্থ মন্ত্রী দত্তখাস কয়েকজন রাঢ়ী ব্রাহ্মণকে উপাধ্যায় উপাধি প্রদান করিলেন। ইহারা নিজের নিজের গাঁঞির সহিত উপাধি যোগ করিয়া পরে বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় রূপে অভিহিত হইতে লাগিলেন। রাজা বল্লাল সেনের নিকট হইতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণও পরবর্ত্তীকালে ১০০ খানি গ্রাম পাইয়া গ্রামের নামানুসারেই লাহিড়ী, চম্পট, সান্ন্যাল প্রভৃতি উপাধিতে পরিচিত হন। রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদিক আচার যখন ধীরে ধীরে লুপ্ত হইতে লাগিল তখন ক্ষিতীশের প্রপৌত্র ধরাধর ২২ গ্রামের সদাচারী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে কুলীন বা কুলাচল ও অবশিষ্ট ৩৪ গ্রামের আচার ভ্রষ্ট রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে শ্রোত্রীয় আখ্যা প্রদান করিলেন। বজ্রবর্ম্মার পৌত্র শ্যামল বর্ম্মা এই সময় বঙ্গদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন ও বৌদ্ধধর্ম্ম উচ্ছেদের চেষ্টা করেন। শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছা করিয়াও তিনি বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাইলেন না। রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি সকলেই বৈদিক আচার ভুলিয়া বৌদ্ধ মতাবলম্বী হইয়াছেন। তিনি তখন পশ্চিম ভারত হইতে যশোধর, বেদগর্ভ, গোবিন্দ, পদ্মনাভ ও বিশ্বজিৎ এই পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। তাঁহাদের বংশধরেরাই পাশ্চাত্ত্য বৈদিক নামে খ্যাত। দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশীয় রাজা বিক্রমাদিত্য যখন গৌড় ও কামরূপ আক্রমণ করেন তখন বঙ্গের রাজা ছিলেন মহীপালের পৌত্র বিগ্রহ পাল। এই সময় বহু দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ রংপুর জলপাইগুড়ি, শিলেট প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। কিছুকাল পর সেনবংশের রাজা বিজয় সেন দেখিলেন বৌদ্ধদের সংস্রবে পুনরায় বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা বৈদিক আচার ত্যাগ করিয়াছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রায় সকলেই উপবীত ত্যাগ করিয়াছে, তখন তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে আরও কয়েকজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে বৈদিক ধর্ম্মে দীক্ষা দিলেন। ইহারাই পরে

দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। "একবাপের দুই বেটা দুই দেশে বাস। বুদ্ধ পাইয়া জাত খাইয়া করিল সর্ব্বনাশ॥ পৈতা ছিড়ি পৈতা চায়, বৈদিকে দেয় পাঁতি। কর্ম্ম পাইয়া ধর্ম্ম খাইল বারেন্দ্র অখ্যাতি।" (রাঢ় বারেন্দ্র কারিকা)।

বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল প্রথমে ছিলেন বৌদ্ধ তান্ত্রিক। ভট্টপাদ সিংহ গিরি তাঁহাকে শৈবধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া হিন্দু করিলেন। বঙ্গদেশ যেন কিছুতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মকে ছাড়িতে চায় না। বল্লাল দেখিলেন ব্রাহ্মণেরা আবার বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ভুলিতেছে তখন তিনি মনে করিলেন দণ্ড ও পুরস্কার দিলে বুঝি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষা পাইবে। "সেইজন্য তিনি কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। ধরাশুর যে ২২ গাঞী ব্রাহ্মণকে কুলীন গণ্য করিয়াছিলেন, বল্লাল তন্মধ্যে ৮ গাঞী ব্রাহ্মণকে মুখ্য কুলীন এবং অবশিষ্ট ১৪ গাঞী গৌণ কুলীন করিলেন। তিনি শ্রোত্রিগণের মধ্যে দোষ গুণের বিচার করিয়া তাঁহাদিগকে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ও কষ্ট শ্রোত্রিয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বল্লাল সেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও কৌলিন্য বিতরণ করেন। বল্লালের সময় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ৮ জন কুলীন, ৮ জন শুদ্ধ শ্রোত্রিয় (সৎ শ্রোত্রিয়) ও ৮৪ জন কষ্ট শ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য হয়। বল্লালের কুলবন্ধনে সন্তুষ্ট না হইয়া কতকগুলি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সহিত ষড়যন্ত্র করেন। বল্লালের ডোমকন্যা বিবাহাদি কারণে লক্ষ্মণ সেনের সহিত বল্লালের বিবাদ হইয়াছিল। সেইজন্য ইহারা কৌলীন্য পান নাই। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ লক্ষ্মণ সেনের পক্ষাবলম্বী হইয়া কৌলীন্য লইতে যান নাই। লক্ষ্মণ সেনের আদেশে বারেন্দ্র কায়স্থ-বৈদ্যগণ কৌলীন্য গ্রহণ করেন নাই। ঢাকুরে লিখিত আছে—বারেন্দ্র-কায়স্থ বৈদ্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ। বল্লাল মর্য্যাদা নাহি লৈলা তিনজন॥ উৎপাৎ করিয়া রাজ্য না থইলা দেশ। স্বস্থান ছাড়িয়া সব গেলা অবশেষে॥ তিনি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণকে কৌলীন্য প্রদান করিয়া স্বপক্ষীয় অনেকের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। সম্বন্ধ নির্ণয় গ্রন্থে প্রকাশ যে বেলা এক প্রহর মধ্যে যে সকল ব্রাহ্মণ বল্লালের সভায় আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে তিনি কৌলিন্য প্রদান করেন নাই। এক প্রহরের পর ও দেড় প্রহরের মধ্যে যাঁহারা আসিয়া ছিলেন তাঁহারা কৌলীন্য পাইয়াছিলেন। দেড় প্রহরের পর ও দ্বিপ্রহরের মধ্যে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা মুখ্য কুলীন

বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি যে এইভাবে কৌলীন্য বিতরণ করিয়াছিলেন তন্মূলে তাঁহার এইরূপ যুক্তি ছিল যে যাহাদের সন্ধ্যা-বন্দনায় অধিক সময় গিয়াছে তাঁহারাই বিলম্বে আসিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাদেরই বৈদিক আচার অধিক ছিল। ঢাকুরে বর্ণিত আছে: "শূদ্রকে দিলাকুল কায়স্থ নিন্দিত। আপন প্রভুত্ব বলে করে অনুচিত"। তেজস্বী ব্রাহ্মণ রাজভট্ট বলিয়াছিলেন "আপনি বৈদ্য। ব্রাহ্মণের কুলপ্রথা নির্ণয়ে আপনি কিরূপে অধিকারী?" বল্লাল রাজভট্টের প্রগল্ভ বাক্য শ্রবণে অতীব ক্রুদ্ধ হন এবং সমস্ত ভট্ট ব্রাহ্মণকে তাঁহার রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। সেই ভট্ট ব্রাহ্মণের বংশধরগণই ভাট ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। তাঁহারা এখনও বল্লালের দণ্ড ভোগ করিতেছেন।

বল্লালসেনের পূর্ব্বে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। তিনি সেই প্রথা উঠাইয়া দেন। বল্লালের সময় হইতেই রাঢ়ী বংশধর রাঢ়ীয় বলিয়া ও বারেন্দ্রের বংশধর বারেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইবার নিয়ম হয়। একদা বল্লাল একটি যজ্ঞ করিয়া কতকগুলি কুলীন ব্রাহ্মণকে একটি স্বর্ণ ধেনু দক্ষিণা দেন। ব্রাহ্মণগণ তাহা কাটিয়া বিভাগ করিয়া লয়েন। এই সংবাদ পাইবামাত্র ইনি সেই কুলীন ব্রাহ্মণগণকে পতিত করেন। যে সকল কুলীন ব্রাহ্মণ অর্থাদি লোভে সেই পতিত ব্রাহ্মণদের ঘরে বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহারা আদি বংশজ নামে খ্যাত হন। এই সকল পতিত ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা কুলাচার্য্যগণকে অর্থাদি দ্বারা বশীভূত করিতে পারিলেন তাঁহারা শ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য হইলেন (বর্ত্তমান সমাজের ইতিবৃত্ত—শ্রীযুক্ত ভাগবৎচন্দ্র দাশ)। ইহার কিছুকাল পরেই ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশব সেনের হাত হইতে বাঙ্গালার সিংহাসন তাঁহার ব্রাহ্মণমন্ত্রী পশুপতি মিশ্রের ষড়যন্ত্র ও জ্যোতির্বিদগণের শঠতায় বক্তিয়ার খিলজীর করতলগত হইল। মুসলমানগণ ইসলাম প্রচারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন রাজ সংশ্রবে আসিয়া কত ব্রাহ্মণ মোছলমানী রিতি রেওয়াজ শিক্ষা করিলেন; আজকালকার হ্যাট কোট বুট প্যান্টালুনের স্থানে তখন তাহারা চোগা চাপকান নাগড়াই পাজামা তহবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায় সাহেব, রায় বাহাদুর উপাধির ন্যায়ই তখন ব্রাহ্মণেরা খাঁ, মজুমদার ভৌমিক উপাধি ধারণ করিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণগণ কুল ভ্রষ্ট হইয়াও কুল গরিমার আত্মশ্লাঘা ভুলিতে পারিল না। তখন ব্রাহ্মণ সমাজে শূকর মাংসও চল হইয়াছিল। সাবর্ণ গোত্রীয় শ্রীধরের পুত্র নীলকণ্ঠ তখন মহানন্দে শূকর ভোজন করিতেন; যথা—ঘৃতে জরজর শূকর ভাজা। ভোজন

করেন বামুন রাজা ॥ ওরে বাপু নীলকণ্ঠ। কেমনে খাইলে শুকের ঘণ্ট? (দোষ তন্ত্র)। দনৌজা মাধব ব্যবস্থা করেন যে কুলীনগণ শ্রোত্রিয়গণকে কন্যা দান করিলে (কুল ভঙ্গ) বংশজ হইবেন। ৪০ জন ব্রাহ্মণ রাজা গণেশের অন্যায় ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া রাঢ় ও উড়িষ্যায় মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারাই মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচিত। "আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনম্। নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানম্ নবধা কুল লক্ষণম্।" কুলীণদের মধ্য হইতে যখন কুলীনের মধ্যে গুণের পরিবর্ত্তে দোষের প্রাচুর্য্য তখন হোসেনশাহের রাজত্বকালে বংশজের ঘরে দেবীবর মিশ্র আবির্ভূত হন। তিনি গুণ বিচার করিয়া কুলবন্ধন করিতে গিয়া দেখিলেন লোম বাছিতে বাছিতে কম্বলই থাকে না। তখন তিনি দোষে দোষে মিলাইয়া কুলবন্ধন করিলেন যমুনা উজান বহিল। ইহারই নাম মেলবন্ধন। দোষ নাই যার, কুল নাই তার। কুলিনদের মধ্যে নানারূপ অপবাদ ও দোষ সংগ্রহ করিয়া 'মেলা' গঠন করা হইল। কোন কুলিনের মধ্যে কি কি দোষ ঘটিয়াছিল, কি কি দোষ করিয়া কে কে মেলের কুলীন হইলেন দেবীবর ঘটক মহাশয় তাঁর 'মেল বিধি' নামক সংস্কৃতগ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে লিখিয়াছেন। দোষগুলিকে তিনশ্রেণীতে বিভাগ করা হইল—জাতিগত দোষ, কুলগত দোষ ও শ্রোত্রিয়গত দোষ। দোষ অনুসারে মেলের নামকরণ হইয়াছে। দেবীবরের 'দোষ নির্ণয়', গ্রন্থে জানা যায় ৩৬টি মেলের মধ্যে ২২টি চরিত্রের নামে, ৬টি গ্রামের নামে, ৩টি উপাধির নামে ও ৫টি দোষের নামে ঘোষিত হয়। প্রকৃতি অনুসারে মেল যথা, বল্লভী, সর্ব্বানন্দী, সুরাই চট্টারাঘবী, ভৈরব ঘটকী, মাধাই, চান্দাই, বিজয় পণ্ডিতী, শতানন্দ খানী মালাধর খানী, দশরথ ঘটকী, কাকুস্থী; চন্দ্রাপতি, গোপাল ঘটকী, বিদ্যাধরী, পরমানন্দমিশ্রী ও ছয়ী এই ২২ টি; গ্রাম অনুসারে মেল যথা ফুলিয়া, খরদহ, বাঙ্গাল, বালী ও নাঁড়িয়া এই ৬টি উপাধি হইতে পণ্ডিত রত্নী, আচম্বিতা ও আচার্য্য শেখরী এই ৩টি দোষ অনুসারে যথা ছায়া পারিহাল, শুঙ্গ সর্ব্বানন্দী, প্রমোদিনী ও হরি মজুমদারী এই ৫টি।

বিভিন্ন জাতির সংশ্রব-দোষে দুষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত মেলগুলির উৎপত্তি পাইয়াছে। বিজয় পণ্ডিতী মেলের সহিত কলু ও কোচ জাতির সংশ্রব; বিদ্যাধরী মেলের সহিত হেড়া ও হালাস্ত জাতির; শ্রীরঙ্গভট্টা ও গোপাল ঘটকী মেলের সহিত রজক জাতির এবং পণ্ডিত রত্নী মেলের সহিত বেড়ুয়া, হাড়ী ও যবনজাতির সংশ্রব। ইহার পরেই কৌলীন্যের পরকাষ্ঠা। "ফুলিয়ঃ পণ্ডিত রত্নি

দেহাটা ভৈরবোঘপি চ। কাকুস্থী চ শতানন্দী শ্রীমদ্দশরথাখ্যক ॥ মালাধরী হরিমজুমদারী চ শুভরাজকঃ। শুঙ্গোসর্ব্বাদিনন্দী চ যবনৈকাদশস্মৃতাঃ। অর্থাৎ ফুলিয়া, পণ্ডিত রত্নী, দেহাটা, ভৈরবঘটকী, কাকুস্থী, শতানন্দখানী, দশরথঘটকী, মালাধর খানী; হরিমজুমদারি, শুভরাজখানী এবং শুঙ্গসর্ব্বানন্দী এই ১১ টি মেল যবন-সংশ্রবে দুষ্ট। এক কথায় কুলজ্ঞেরা বলেন "কোচপোদ আর হেড়া হালাস্ত রজক। কলু হাড়ি বেড়ুয়া যবন অন্ত্যজ"। এই কয়েকটি জাতির সংশ্রমে আসিয়াই জাতি গত মেলের কুলীন সৃষ্টি হইয়াছে।

তার পর কুলগত দোষ। যে সব মেল কুলগত দোষে উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯টি মেল রণ্ডদোষে, ১২টি বলাৎকার দোষে; ৬টি বিপর্য্যায় দোষে, ৭টি খণ্ডদোষে, ২টি স্বজনাক্ষেপে, ২টি অন্যপুর্ব্বাদোষে, ১টি বিবর্জ্জন দোষে; ২টি ব্রহ্মহত্যাদোষে ও ৫টি মেল কন্যাবহির্গমন দোষে হইয়াছে। কুলজ্ঞদের মতে কন্যার অভাব হইলে, কুলের অভাব হইলে, এবং রাঁড়িকা বা বেশ্যাগমন করিলে রণ্ডদোষ হয়। পিতৃপক্ষে সাত ও মাতৃপক্ষে পাঁচ পুরুষের মধ্যে বিবাহ করিলে স্বজনাদোষ হয়। পর্য্যায় ভাঙ্গিয়া কার্য্য করিলে বিপর্য্যায় দোষ হয়। অবিবাহিতা কন্যার সহিত পরপুরুষের সংশ্রব হইলে অন্যপুর্ব্বা দোষ হয়। ইহা ছাড়া মেলী কুলীনের মধ্যে আরও অনেক কুলগত দোষ ছিল, যেমন জীবিত ব্যক্তির পিণ্ডদান, ত্যাজ্যপুত্র, জন্মান্ধ কুষ্ঠরোগ, নীচগৃহে বিবাহ, খোড়ীদোষ এবং বয়োজ্যেষ্ঠা, মাতৃনামা সগোত্রীয়, দুষ্টকন্যা অঙ্গহীনা, কাণা, কুব্জা ও বাগজড়া কন্যার পাণিগ্রহণ। একই পাত্রে একই কন্যাকে দুইবার বিবাহ দিলে তাহাকে খোড়ীদোষ বলে। পিণ্ড দোষে বল্লভী, সর্ব্বানন্দী; মাধাই, শতানন্দ, ভৈরবঘটকী; কাকুস্থী মেলের উৎপত্তি। রণ্ডদোষে সর্ব্বনন্দী, আচার্য্য শেখরী, প্রমোদিনী কুকস্থী; দেহাটা ও নাঁড়িয়া মেলের উৎপত্তি। বিপর্যায় দোষে সর্ব্বানন্দী, পণ্ডিত রত্নী; চান্দাই, প্রমোদিনর, আচম্বিতা ও শ্রীবর্দ্ধনর মেলের উৎপত্তি। বলাৎকার দোষে সর্ব্বনন্দী, আচার্য্য শেখরী ছায়ানরেন্দী, প্রমোদিনী, শতানন্দ, ভৈরবঘটকী, আচম্বিতা, পাঁড়িয়া শ্রীবর্দ্ধনী; রাঘব ঘোষালী, হরি মজুমদারী ও ছয়ী মেলের উৎপত্তি। স্বজনা দোষে পণ্ডিত রত্নী ও দেহাটা মেলের উৎপত্তি। খণ্ড দোষে গোপাল ঘটকী, চট্ট রাঘবী বিদ্যাধরী, শ্রীরঙ্গ ভট্টি, বালি পরমানন্দ মিশ্রী ও দশরথঘটকী মেলের উৎপত্তি। অন্য পুর্ব্বাদোষে ছায়ানরেন্দ্রী ও সুরাই মেলের উৎপত্তি। ব্রহ্মহত্যাদোষে চান্দাই ও মাধাই মেলের উৎপত্তি। ত্যাজ্যপুত্র দোষে আচম্বিতা মেলের উৎপত্তি এবং কন্যা বহির্গমন

দোষে দশরথ ঘটকী, শুভরাজখানী, শুঙ্গ সর্ব্বানন্দী ও হরি মজুমদারী মেলের উৎপত্তি। উক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে যে কোন কোন কুলীনের মেলে ২।৩।৪টি করিয়াও দোষ বিদ্যমান। এইরূপ শ্রোত্রিয় গত দোষের মধ্যে গড়গাড়ি দোষে ৯টি, হড় দোষে ৬টি, পিপ্পলীদোষে ১টি, কেশরকোণী দোষে ১টি; চৌৎখণ্ডী দোষে ৪টি, কুলভিদোষে ২টি ও পারিহাল দোষে ৪টি মেলের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

নিম্নে কুলজ্ঞদের রচিত বাঙ্গালা ভাষার মেল-ইতিহাস হইতে মেলের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিতেছি। ফুলিয়া মেল—নাদা, ধাঁদা, বারুই হাটি ও মুলুকজুড়ী এই চারি দোষে ফুলিয়া মেলের উৎপত্তি। শ্রীনাথ চট্টের দুই অবিবাহিতা কন্যা ধাঁদা নামক খালে জল আনিতে যায়। নিকটেই হাঁসাই নামে এক মুসলমান খানাদার থাকিত। সে দুই কন্যাকে ধরিয়া বলাৎকার করে। কংসারি পুতিতুণ্ড ইহার এক কন্যাকে এবং গঙ্গাধর বন্দ্য অন্য কন্যাকে বিবাহ করেন। গঙ্গাধরের সহিত নীলকণ্ঠ ও নীলকণ্ঠের সহিত গঙ্গানন্দের কুল করিয়া তাঁহারা ধাঁদা দোষে দুষ্ট হইলেন। 'অনাথ শ্রীনাথসুতা ধন্দঘাট স্থলে গতা। হাঁসাই খানাদারে! সেই কন্যা বিভাকরে বন্দ্য গঙ্গাবরে॥ (মেলমালা)। খড়দহ মেল—শ্রীকণ্ঠে পরিবাদ লোকে কানাকানি। ভাস্কর রমণ করেন যবন রমণী॥ বারেহাটি সুখনালী আছে কিছু যোগে। মসুন্নাতে আনাই কোটাল বাড়ে অতি রাগে (মেলরহস্য)। বল্লভী মেল—বশিষ্ঠ নন্দিনী এক কুকর্ম্ম করিল। পিতৃ আজ্ঞায় সতীন ঝিকে পিণ্ড খাওয়াইল॥ দুষ্ট নারী উদর ভারী তারে করি বিয়া। ধরণী ধরিলেন ধরা দুই পিণ্ড পাইয়া। তপন গাঙ্গুলী ছিলেন সেই কন্যাতে লোভী। সর্ব্বানন্দ পালটি হইলেন বল্লভে বল্লভী॥ সর্ব্বানন্দ ঘোষালের বিয়া অনর্থের মূল। বশিষ্ট নপাড়ি কন্যা দেখি প্রেমাকুল॥ পুত্রবতী রামা সে প্রমদ আগল। আর পক্ষের কন্যা দেখি লজ্জায় বিকল॥ তপন গাঙ্গুলী ছিল তায় মজিয়াছে মন। সং মার দিল পিণ্ড কুলরক্ষা কারণ॥ (কুল রমা)। নপাড়ি বশিষ্ঠ কন্যা সর্ব্বঘোষে লয়। অন্য পক্ষের কন্যা তপন গাঙ্গের প্রেমে রয়॥ (মেল প্রকৃতি নির্ণয়॥ সর্ব্বানন্দী মেল—রণ্ডে পিণ্ডে বলাৎকার বিপর্য্যয়ে হরিমুতঃ। সগতো রাঘবে গাঙ্গে রাঘবো-হপি সবেগতঃ॥ তাহার পর আর দোষ আছেত বিস্তর। সিন্দুগ্রামস্থ বিশোচট্ট বর্ণসঙ্কর॥ (মেলরহস্য)। পণ্ডিত রত্নী মেল—বিষ্ণু পুত্র উদ্ধরণ সুত দেবকীর হল কুল। চট্ট হারোমুত যবনদোষী

করে তার মূল॥ (মেল প্রকৃতি নির্ণয়)। ক্ষেমা করি গাঙ্গ শৌরি যবন দোষ পায়। প্রজাপতি চট্টকরি পারি বিপর্য্যায়॥ "দৈবকী করেন কুল চট্ট গড়ুড়েতে। সুখনালী স্বজনা যবন দোষ তাতে॥ পরেতে উচিত হইলেন চট্ট দেবীবর। বলাৎকার দোষ পাইয়া হইলেন ফাফর॥ হাড়ি দোষ লক্ষ্মীনাথে বেড়ুয়া দৈত্যারি সাথে, গোপাল বেদের যোগে সঙ্গে॥ হায়াসখানি সুখ নালী, পিতার আছিল গালি, ছক্কাড় কন্যাতে পরিবাদ। শেষে আঠা সঙ্গে যোগ, হইল বিষম রোগ, জাতি কুলে পড়ে পরমাদ॥ বৈরি হইল যোগেশ্বর, আর ঘটক দেবীবর, অদত্তা চারি ঝি। চলে যাবে জগন্নাথ, কিনিয়া খাইল ভাত, সিক্ দারে কন্যা দিব ভেট। রুক্মিণী আদি চারি ঝি, এহার কহিব কি, তারা মাসে মাসে ** * পেট॥ শৌরির যবন দোষ পজোরুদ্র ঘোষে। রুদ্র ঘোষের চট্ট বিয়া গেলা এই দোষে। অদত্তা লোকাইর কন্যা রজকের ঘরে। সেই কন্যা বঙ্গমেলে কংশারি চট্ট করে॥ (মেলরহস্য)। বাঙ্গাল মেল—বারুই হাটী দোষ পাইয়া তপন চিন্তিত। পরমেশ্বর পুতিতুণ্ড রজকে নিন্দিত॥ হিরণ্য রত্নাকর সহস্রাক্ষ। মধু লইয়া চাক্ষ মাক্ষ। হিরণ্যের হিড়া মুকুন্দের মদ। পঞ্জ ছাড়েন পরমপদ॥ (মেলরহস্য)। ছায়ানরেন্দ্রী মেল—তবে নরেন্দ্র মিশ্র বৃহস্পতির তনয়। তাহার ভগিনীর কথা লোকেতে চর্চ্চয়! কান্দে সদাশিব চট্ট অবসাথ রাজ। অন্যপূর্ব্বা বলিয়া যার বড় হইয়া লাজ॥ ধরিয়া বাপের কন্যা পুষ্প বিয়া করে। দেখিয়া জননী তারে ক্রোধে বটী মারে। কন্যা কাটা গেল নর রক্তে ডোল ডোল। ছায়ানিয়া মেলে বুঝি পড়িল গণ্ডগোল। (কুলরমা) সুরাই মেল—সুর দোষ সুরাই মেল সুরাই ঘটকে। পালটি হইলেন ত্রিপুরারি কুলাচার্য্যে ডাকে॥ শ্রীকান্ত পালটি হলেন মতান্তরে মানি। সমাজগত দোষ আর বলাৎকার গণি॥ হেনকালে ধ্রুবানন্দ বলিল আসিয়া। প্রমাদে পড়িলি সদা কন্যা বিয়া দিয়া॥ বলাৎকার করে বৃহস্পতির তনয়। উহার ভগিনী তাহে লোকেতে চর্চ্চয়॥ কান্দে কান্দে সদাশিব অবসাথ রাজ। অন্যপূর্ব্বা কন্যা রৈলা বড় পাইনু লাজ॥ (মেলরহস্য)। আচার্য্য শেখরী তিলোচন বন্দ্যোতে মেল আচার্য্য শেখরী। পালটী হইলেন কমলেশ্বর বলাৎকারে পরি॥ ছিৎপারি গুড়ি দোষ চট্টজে রাঘব। বর্ণসঙ্কর দোষ পাইয়া, পাত্রেন পরাভব॥ (মেলবন্ধ)। ত্রিলোচন বন্দ্য মেল আচার্য্য শেখরী। পালটি হইলেন পুষ্করাক্ষ বলাৎকার করি॥ (দোষাবলী)। আচার্য্য শেখরে দোষ প্রধান যবন। এই কুলে দেখি কুলীন নাই একজন। (মেলপ্রকাশ)। গোপালঘটকী মেল—গোপাল ঘটক ফুলিয়া গদাধর সুত।

রজক বাদ পাইয়া তিনি হইলেন অদ্ভুত ॥ গোপীর পৌত্রের যোগ, তাতে শৌণ্ডিকাভি যোগ, পরিবর্ত্ত করে বিপর্য্যয় ॥ শুনরে পরমানন্দ, পড়িলে তোমার ফন্দ, বিঘ্নেশ শিকদারের কন্যা বিয়া ॥ গোপাল গাজিপুরে বাস, আঠাইর সর্ব্বনাশ, হাসন খাঁয়ের খায় হেড়া রুটি ॥ (মেল রহস্য। চট্ট রাঘবী মেল তেকাইবেটা রাঘবচট্টের দিণ্ডিতী নির্ব্বাহ। হিরণ্য বন্দ্যজে করি হেড়াতে বিবাহ ॥ (মেলরহস্য)। বিজয় পণ্ডিতি মেল—জটাধর পুত্র বিজয় কলুবাদী কয়। ঈশ্বর ঘোষ কাকে কুল বলাৎকার কয় ॥ (মেলবন্ধ)। কলুদোষে বিজোদুষ্টঃ সদাইঃ কোচদোষতঃ। পল্লীহ্য গুড়ি দোষণ পণ্ডত্বং বিজয়োগতঃ ॥ বিজয় সাগর দিয়া জটাধর সুত। তাহার কুলের কথা বড়ই অদ্ভুত ॥ তাহার এক কন্যা কলুর দ্বিজে নিল। সেই কন্যা আনি কাক ঘোষে বিয়া দিল ॥ আড়িয়ার মুখটি সদাই তাহার তুলা যায়। পল্লীহত্যা কোচবাদ গুড় দোষে পায় ॥ (মেলরহস্য)। বিজয় পণ্ডিতের মেলে কুল নাই তখন। কোচকুল পরীবাদ আছে অচেতন। (কুলরমা) মাধাই মেল—মধুকে করিয়া পিণ্ড চৌৎখণ্ডী পাইয়া। ব্রহ্মহত্যা দোষ পাইল চন্দ্রেরে করিয়া ॥ (দোষাবলী)। চান্দাই মেল ব্রহ্মবধ দোষ চান্দে, পড়িয়া চৌৎখণ্ডী কান্দে, মধুচট্ট তরে পিতৃবরে ॥ (মেল রহস্য)। লম্বোদর সুত দুই চাঁদাই মাধাই। ব্রহ্ম ইত্যাদি চৌৎখণ্ডী নানা দোষ পাই। (মেল চন্দ্রিকা)। বিদ্যাধরী মেল—অকথ্য বলাৎকারাদি দোষে মরি মরি। বিদ্যাধরীকে সবাই করে ধরাধরি ॥ (মেলমালা) পারিহাল মেল উপযমে পারিকন্যাং খঞ্জ দোষ স্ততঃ পরং। বলাৎকার স্বয়ং কৃত্বা দিগম্বর সুতো মৃতঃ ॥ পঞ্জো রুণ্ড খঞ্জদোষ বলাৎকার পাইয়া। তৎসুতে রাঘবে করেন পারিহালে বিয়া ॥ আর্ত্তি করেন পাঁচু বন্দ্য পশাই বন্দ্যের বেটা। তাহারে করিয়া হইল বলাৎকারের ঘটা ॥ রাঘবেতে পারিহাল মেল পারিহাল। গুড় দোষ খানি তাথে হইয়াছে মিশাল ॥ (মেল রহস্য)। পশুবন্দ্যো বেটা পাঁচু নানাদোষে দোষী। রাঘব কন্যার দানে তারে কৈল খুসী ॥ (মেলচন্দ্রিকা)। শ্রীরঙ্গ ভট্টি মেল—শ্রীরঙ্গে শ্রীরঙ্গ ভট্টী হইল নির্ব্বাহ। চক্রপাণি সুত পুণ্ডোর সন্দিগ্ধ বিবাহ ॥ রঘুর বেটা বাগ আর্ত্তি বশিষ্ঠের নাতি। তাহারে করিয়া হইল কুলভীতে গতি ॥ (মেল রহস্য)। প্রমোদিনী মেল—বাসুসুত সুরেশ্বরের চৌৎখণ্ডী বিয়া। রুণ্ড বলাৎকার পায়েন তাহারে করিয়া ॥ (মেল রহস্য)। দাস সুত সুরেশ্বর বন্দ্যোরে করিয়া। শব সম্পর্ক বলাৎকার রুণ্ডদোষ পাইয়া ॥ (দোষাবলী)। বালি মেল কি কর খাসী খুসী

আমরা ঘোড়ার ঘাসী। সুখনালী পণ্ডিত রত্নী কুটুম বিপ্রদাসী। (মেলপ্রকাশ)। চন্দ্রাপতি মেল—মঘ যোগী ভুলাই দ্বিজে চন্দ্রশেখর মজে। তাই কেশরী অজের কুল খর্ব্বে বিরাজে ॥ ছাত্রিশ মেলেতে দেখি এই সব কথা। দেবীবর এক ক্ষুরে মুড়াইল মাথা। (মেলমালা)। শতানন্দ খানি মেল—যবনাম্ন বলাৎকারাৎ শতানন্দো হতাদরঃ ॥ ধনো বংশে বিজয় সুত শ্রীহর্ষ পুরাই। বলেতে করিয়া লভ্য বলাৎকার পাই ॥ জগদা নন্দ ধন্দো করি যবন দোষ পাইয়া। বসিয়াছেন শতানন্দ নিরানন্দ হইয়া। গুড়ি পারিহাল দোষে শতানন্দ খানী। বলাৎকার যবনাম্ন ধন্দ নিন্দা গণি। (মেলরহস্য)। ভৈরব ঘটকী মেল—পারিবেত্তা মৈথিলানি যবনস্তদনন্তরং বলাৎকারো বলাৎকার পুনর্যবন দোষতঃ ॥ শ্রীহর্ষ মুখৈটি করি যবন বলাৎকার। আসাই চট্টে লভ্য করি যবন পুনর্ব্বার ॥ (মেলরহস্য)। কাকুৎস্থী মেল—কাকুৎস্থী হইল মেল নানা দোষ পাইয়া। মহীর বেটা মধু করেন খাড়ীর কন্যা বিয়া ॥ (মেলরহস্য)। খাঁড়ি-হাড়ী সংসর্গে কাকুৎস্থের শেষে। কাঞ্জি বিল্বী শাখারীর আরো দোষ ঘোষে ॥ (মেলচন্দ্রিকা)। আচম্বিতা মেল—বলাৎকার বিপর্য্যয় গতালঙ্কার দোষতঃ। পিত্যসন্তাজ্য দোষেণ পীত মণ্ডীকদোষতঃ ॥ মনোহর আর্ত্তি করি করি বলাৎকার। পীত মুণ্ডী দোষ পাইয়া লাগে চমৎকার। (মেলরহস্য)। দেহাটা মেল—দেহাটিয়া দানপতি কুলেতে প্রধান। ভাগিনা সহিত কুল দেখ বিদ্যমান ॥ শ্রীনিবাস গাঙ্গুলি সঙ্গে পরে হইল কুল। পালটি হইলেন শ্রীনিবাস যবন দোষ মূল ॥ দেহাটিয়া দানপতি শ্রীনিবাসে যায়। বাচ্য স্বজনা দোষে যখন দোষ তায় ॥" (মেলরহস্য)। বাপীসুত দানপতি কুলেতে প্রধান। ভাগিনী সহিত কুল দেখি বিদ্যমান। (দোষাবলী) ধরাধরী মেল—"সুখনালী গড়গাড়িভ্যাং তথা হলাস্তকেন চ। ধরাধারা নিধোজন্যাঃ পপাত ধরণীতলে ॥ নিধোসুত ধরধর কুলেতে প্রধান। হিরণ্য বন্দ্যজে করি হালাস্তকে যান। সুখনালী দোষ আর স্বকীয় গড়গাড়। হিরণ্য হইলেন পালটি মেল ধরাধরী ॥ (মেলরহস্য)। দশরথঘটকী মেল—উন্দুরিয়া জটাধর সঙ্গে বিজয়ের কুল। খঞ্জদোষে খঞ্জ হইলেন কন্যাতে আকুল ॥ তৎতনয় দশরথ কন্যা হেতু যান। প্রথমে আপদ ঘটে ভুবন বিশ্বাস ॥ (মেলরহস্য)। ছয়ী-মেল—বন্দ্যাজ্জায়াবিনা কন্যা নীতা চ ছয়িকস্য চ। বন্দ্য কেশরং বলাৎকৃত্বা তস্যাঃ পিণ্ডো মৃতচ্ছয়িঃ ॥

লোমাই দাঁয়ারি তাহান কন্যানিল হরি। ক্ষেমা করেন কেশব বন্দ্য

বলাৎকার করি ॥ (মেলরহস্য)। সৌদামিনী ছয়ী কন্যা জানহ নিশ্চয়। কংস হাড়ীবাদে অর্ক দোপড়া মেয়ে লয় ॥ (মেলচন্দ্রিকা) মালাধর খানি মেল—উঢ়া কুন্দাসুতা মালাধরেণ রণ্ডদোষতঃ। যবনেঽপি স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ো মুখো মৃতঃ পুরা।" তৎসুত মৃত্যুঞ্জয় যবনেতে যায়। তৎসুত মালাধর কুন্দদোষ তায় ॥ (মেলরহস্য)তে কারণ শুম্ভভট্ট মেল ছিল ভঙ্গ। বাপাপুতি আঠা মেল বিপর্য্যায় রঙ্গ। (কুলরমা)। অকথ্য অগম্যায় করে নানা রঙ্গ। নিতাই হরিদাস মালাধরে সঙ্গ (মেলচন্দ্রিকা)। নড়িয়া মেল—গজেন্দ্র রায় ধনোবন্দ্যোর কন্যা করে বিয়া। স্থগিত হইলেন গাঙ্গ তাহানে করিয়া ॥ তাহানে করিয়া গঙ্গে বড় দর্প করি। কিণ্ডিরাত্তি বলাই চট্ট বলাৎকার করি ॥ (মেলরহস্য)। গুণাকরে অগুন্দি দোষ গুড়দোষ পেয়ে। পিতৃবরে বিভা করে মাতৃতুল্য মেয়ে ॥ (মেলমালা)। শ্রীবর্দ্ধনী মেল—প্রমোদিনী বাধ্যকুল শ্রীবর্দ্ধণীমেল। গোলক অন্যপূর্ব্বা সপ্তশতী শেল ॥ (মেলচন্দ্রিকা)। পরমানন্দ মিশ্রী মেল—তৎসুত পরমা নন্দে দিণ্ড করে বিয়া। তাহার এক কন্যা বটু দ্বিজে গেল লইয়া ॥ দৈত্যারি ঘোষালে দেন দুষ্ট কন্যা বিয়া। পরমানন্দ মিশ্রী মেল এই দোষ পাইয়া ॥ (মেল রহস্য)। রাঘব ঘোষালী মেল—সুদর্শন সুত দয়ু শ্রীরঙ্গ তৎসুত। শ্রোত্রিয়ে হরিয়া কন্যা করে কুলচ্যুত ॥ মনদুখে বাসুমুখে করেন বলাৎকার। বিপর্য্যায় বারেহাটী লাগে চমৎকার। (মেলরহস্য)। শুভরাজ খাণী মেল—তৎসুত শুভরাজ বন্দ্য মহাশয়। বলেতে শৌরির কন্যা করেন পরিণয় ॥ যবন পাইয়া কৃত্তিবাসে করে নাশ। শুভরাজে শুভরা পালটী কৃত্তিবাস ॥ (মেলরহস্য)। শুঙ্গো সর্ব্বানন্দী মেল—তৎসুত হেরম্বমচথ কুলে চূড়ামণি। গৌরিবর গাঙ্গ করি যবন পায়েন তিনি ॥ তৎসুত সর্ব্বানন্দ তৎসুত বাণী। তাহান হইল দোষ তহসীল আমিনী ॥ তহশীল আমিনে তাহার কন্যা নিয়াছিল। গৌরিসুত নিতাই গাঙ্গে সেই কন্যা দিল ॥ (মেলরহস্য)। হরি মজুমদারী মেল— যবনঃ পীতমুণ্ডীচ দিণ্ডিরায়ে ততো গতঃ। মজুমদার বলাৎকারাৎ মৃতো বাণী সুতাত্মজঃ ॥ তৎসুত লম্বোদর বাণীসুত তায়। আর্ত্তি গাঙ্গ অরবিন্দ যবনদোষ পায় ॥ তৎসুত হরিহর মধ্য অংশ মুখহরি। হরি মজুমদার তাহার কন্যা নিল হরি ॥ রায়ের দোষ পাইয়া হরি যায়েন গড়াগড়ি। শ্রীনিবাস ঘোষালে ক্ষেম্য বলাৎকার করি ॥ (মেলরহস্য)॥ পিতার ছিল হাড়ী নিজ দোপড়া পোড়ারি। এই দোষে হৈল মেল হরি মজুমদারী (মেল প্রকাশ)।

রায় মেল কুলেতে কুণ্ঠিত দিণ্ডী বলাৎকার দোষে। যাদব বন্দ্যো রায় মেল কুলাচার্য্যে ঘোষে।

আধুনিক কুলতত্ত্বে ছায়া মেলের পরিবর্ত্তে রায় মেলের উল্লেখ দেখা যায়। যাহা হইতে মেলের সৃষ্টি তিনি প্রকৃতি এবং যাহার সহিত কুল করিয়া সম-মর্য্যাদা ঘটে তিনিই পালটি। যাহাদের সঙ্গে মেল হয় তাঁহারা মেলী, যাঁহাদের সঙ্গে মেল হইল না তাঁহারা অমেলী। মেলে না আসিয়া অনেকেই বংশজ আখ্যা লাভ করিয়াছেন। মেলের সহিত আমলের দেখা হইলেই ভাগ হয়। প্রত্যেক মেলেই কয়েকটি করিয়া ভাগ আছে, ভাগের মধ্যেও নানারূপ রহস্য আছে। ফুলিয়া মেলের একটি ভাগের নাম বৈদ্যনাথী ভাগ। "বংশধরের পুত্র কৃষ্ণানন্দ বেশ্যাগমন হেতু রণ্ডদোষ প্রাপ্ত মুং পাঁচুর সঙ্গে কুল করেন। বংশধর নিজের সংশ্রব বাঁচাইবার জন্য জীবিত কৃষ্ণানন্দ মরিয়াছে বলিয়া তাহার নামে পিণ্ড দিয়া শ্রাদ্ধ করেন। কৃষ্ণানন্দ ইহাতে বিপদগ্রস্ত হইয়া বলাৎকারে হরিমিশ্র সুত কৃষ্ণানন্দকে আপন ভগিনী দান করেন। হরিমিশ্র ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্র কৃষ্ণানন্দ মরিয়াছে বলিয়া তাহার পিণ্ড দেন। আবার ওদিকে বংশধর জীবিত পুত্রের পিণ্ড দেওয়ার জন্য নিজেও দোষযুক্ত হওয়ায় তাহার কন্যা যখন কেহ লইতে স্বীকার নহে, তখন চং দিনকরের পুত্র কৃষ্ণানন্দকে আপন অপরা কন্যা দান করেন, তাহাতে কৃষ্ণানন্দেরও কিছু উপকার হয়, যেহেতু সে পূর্ব্বে কাঞ্জিকন্যা বিবাহ হেতু ঠেলা ছিল। একে কাঞ্জিকন্যা বিবাহ, তাহার উপর আবার বংশধরের কন্যাগ্রহণ, পুত্রের এই সকল দোষে রুষ্ট হইয়া সে মরিয়াছে বলিয়া দিনকরও তাহার পিণ্ড দেন। তখন তিনি কৃষ্ণানন্দই সমানদশা প্রাপ্ত হওয়ায় আপন আপন পিতার উপর প্রতিশোধ লইতে তিনজনে একজোট হইয়া আপন আপন পিতা মরিয়াছে বলিয়া তাহাদের শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ড প্রদান করেন। এখন দোষ হইতেছে পাঁচুর রণ্ডদোষ এবং তিন কৃষ্ণানন্দ ও তাহাদের বাপের পিণ্ডদোষ। মাঝে পড়িয়া ধরা পড়িলা বংশধরের পুত্রহেতু বৈদ্যনাথ, তাহা হইতে বৈদ্যনাথী ভাগ হইল।"

পরে "ভুবনজ জগন্নাথঘোষাল সৃষ্ট বন্দ্যকেশবের কন্যা অং চং দেবীদাস বিবাহ করেন। কাং বং কৃষ্ণানন্দ বলপূর্ব্বক নরহরি ভট্টকে কন্যা দেন। আবার নরহরির কন্যা বলপূর্ব্বক সন্তোষ মুখকে দেওয়া হয়। অং চং দেবীদাস বলপূর্ব্বক রতিকান্ত মুখের সহিত কন্যা বিবাহ দেন, তাহাতে বিপর্য্যায় দোষ ঘটে। পরে সন্তোষমুখের পুত্র রমাকান্ত চণ্ডীদাসবন্দ্যের কন্যাকে বলাৎকারে

বিবাহ করেন। নরহরি আবার বলপূর্ব্বক সন্তোষমুখের কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। সন্তোষমুখের পুত্র রমাকান্ত কাং বং কৃষ্ণানন্দের কন্যা বলাৎকারে বিবাহ করেন, ইহাতে বিপর্য্যায় হইল।" (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ)। কেশবের কি কহিব কথা জগো ঘোষালীর নিয়া সুতা, দোলমঞ্চে করিল নিছনি ॥ চাবা খাইয়া সুন্দরী, * * * সুখ ভোগকরি, শেষে দেবী চট্টের গৃহিনী"। কৃষ্ণানন্দে বলাৎকার, নরাইতে চমৎকার, সন্তোষে নরাই করেন বলে। বিপর্য্যায় দেবীদাসে, বলে রতি সর্ব্বনেশে, রমাই চণ্ডীদাসের মজায় কুলে"। "লক্ষ্মণ গুণানন্দ খানী, অনন্তের কন্যা আনি, বিহা করি করে বলাৎকার। দুর্গাই নরাই সুতা, কৃষ্ণাই সুতা বিবাহিতা, বিপর্য্যায় কিবা কুল তার ॥ কৃষ্ণানন্দ নিরানন্দ হড় বিয়া করি। বলাৎকার তায় আইল চট্ট নরহরি ॥" "রণ্ড পিণ্ড বলাৎকার বিপর্য্যায় পাইয়া। বাবলা শ্রীনাথ ক্ষেমা মধুতে মজিয়া ॥" "সুখনালী জাফর খানী, দিণ্ডীদোষ তাতে গণি, যায় গদাধরের দর্ভযোগ ॥ নৃসিংহ চট্টের নারী, কোথা গেল কারে ধরি, শ্রীমন্তখানী বাড়ে রোগ ॥ যবন গামী কন্যাসুতে, ত্রৈলক্য মজিল তাতে; আর দোষ তাতে কিছু গণি। আঠাকাশী দুইভাই, মংসরে না পাইল ঠাই, কুপণদোষে কুল টানাটানি।" "গং বং বাণের কন্যা দিণ্ডীরায় হরণ করেন। এই বাণের পুত্র নারায়ণ কুষ্ঠ রোগী বাণের কন্যাকে হরণ করেন দ্বিতীয় গং বং বাণের অপর পুত্র দিণ্ডীরায় কর্ত্তৃক ভগিনী হরণের দোষে লিপ্ত করার জন্য পূর্ব্বের রাগ ও বিদ্বেষ বশতঃ পাং চং বাণের বাড়ী দিয়া তাহার অবিবাহিত কন্যাকে নষ্ট করেন। যৎকালে গং বং বাণপুত্র সেই কন্যাকে লইয়া পা চং বাণের বাড়ীর একটা ঘরে রঙ্গরসে রত, সেই সময় কন্যার মা জানিতে পারিয়া কন্যাকে বটী দিয়া কাটিয়া ফেলে। এট কাটা যাওয়ায় ইহাদের সংশ্রবে আগত কুলীনেরা "কাটাবাণ" ভাগযুক্ত হইল।" (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ)।

"বশিষ্ঠ-নন্দিনী সর্ব্বানন্দের বনিতা। সতীমা হইয়া ভোজন করান যে দুহিতা ॥ অজ্ঞাত ধরণী প্রাণ ধরাইতে নারে। উদর অসুস্থা কন্যা পরে বিভা করে"। করিয়া বল্লভী মেল এই দোষ পাইয়া। গোবিন্দ খোড়ি মৈথিলানী রম্ব গর্ভ করিয়া।" "রণ্ডো পিণ্ড বলাৎকারো বিপর্য্যায় স্তুথৈবচ। ব্রহ্মহত্যা হড়োদ্বাহঃ পর্ণ্ডভ হরিবল্লভী।" "জানকী নাথের গাঙ্গ যদু বলাৎকার। জগো ঘোষালের দোষ বানী বন্দ্য আর ॥" ফুলিয়া মেলের একটি থাকের নাম বীরভদ্রী। "ফুং মুং পার্ব্বতীনাথ ঠাকুর নিত্যানন্দাত্মজ বীরভদ্র গোস্বামীর

কন্যা বিবাহ করেন। বীরভদ্রের গাঞি ঠিক ছিল না, সেইজন্য ঘটকেরা তাঁহাকে বটব্যাল বলিয়া স্বীকার করেন। বীরভদ্রের সংশ্রবে পার্ব্বতী নাথের কুলে দোষ পড়। সেইজন্য কোন কুলীন সন্তান তাঁহার কন্যা বিবাহ করিতে চাহিতেন না। কাজেই পার্ব্বতী জোর করিয়া গয় ঘড় বন্দ্য লক্ষ্মীনাথসুত হরিকে ধরিয়া কন্যা দান করেন। কিন্তু হরি বন্দ্য বাসি-বিহা না করিয়া পলাইয়া যান। পরদিন পার্ব্বতী নাথ হরি বন্দ্যকে না পাইয়া তাহার পুত্র রামদাসকে ধরিয়া "তুমিই পূর্ব্বরাত্রে বিবাহ করিয়াছ" এইরূপ বলিয়া বলপূর্ব্বক তাহার সহিত কন্যার বাসি বিবাহ দিলেন। এদিকে বরের মা ও কন্যার মা উভয়ে সহোদরা ছিলেন, অর্থাৎ পার্ব্বতী ও হরি উভয়েই ঘোষ কানু রায়ের কন্যা বিবাহ করেন, কাজেই হরিবন্দ্য বিবাহ করায় প্রথমে পার্ব্বতীর কন্যা রামদাসের বিমাতা, পরে পত্নী ও শেষে আবার ভগিনী বলিয়া প্রকাশ পাইল। এইভাবে বীরভদ্রী থাকের উৎপত্তি হইল।" (ঐ)। আদৌ পিত্রে ততঃ পুত্রে ভ্রাত্রে তৎ কন্যকাং দদৌ বলাৎকারে পার্ব্বতীশম্ভিসম্বন্ধ্যা ন্বিতো বদেৎ ॥ হরি সুত রামদাস বিমাতার পতি। মুখের কন্যা বিহা করি গেল তার জাতি। কন্যার বরের মাতা দুই সহোদরা। বিমাতা ভগিনী প্রতি কোথা আছে কারা ॥ গাঞি পিতাড়ী বরুণ বাড়ী। বল করিয়া ধরে হাড়ী ॥ ঠৌকিল যাঠিয়া বিষম ফান্দে। হাড়ীর কোদাল ঠৌকিল কান্দে ॥ সম্পর্ক বল্লভী মেলে। টুটিল যাঠিয়া বিষম শেলে। যায় গড়াগড়ি ভূমিতলে। জাত নাই কুলীনে বল্লে, নাই ঘটকে বলে ॥ বরুণ বসতি নরসিংহ মজুমদার। পিতাড়ী বংশেতে জন্ম আজ কুলাঙ্গার ॥ তাহার রমণী ছিল পরমা সুন্দরী। তাহাতে গমন করেন ঋতুধ্বজ হাড়ী ॥ তাহাতে জন্মিল এক সুন্দরী তনয়া। অনন্তসুত ষষ্ঠীদাসে তারে করে বিয়া ॥"

মুসলমান সংস্পর্শে মেলী কুলীনের মধ্যে আরও বহু প্রকার দোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। এখানে হরিহর কবীন্দ্রের "দোষতন্ত্র" হইতে সংক্ষেপে কয়েকটি দোষ মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। খড়দহে—১ ভাস্করে যবনীগমনং। ২ বাণী ব্রাহ্মণ্যাং পাঠানগত দোষঃ।" ইত্যাদি। ফুলিয়ায়—১ পূর্ব্বং জাফরখানী দোষঃ। ২ ইদানীং সাহসখানী চাঁদখানী সম্পর্কঃ। গুণানন্দ ছোট ঠাকুরস্য পত্নী সহিতা অদত্তা কন্যা সাহস-খান যবনেন নীতা অতঃ সাহসখানী ভাবঃ। তথাচ—গুণানন্দস্য পত্নত্বং তৎপত্নী ব্যাভিচারিণী। সাহসায় সুতাহ দত্তা নিশ্চলো জায়তে ধ্রুবম্" ॥ ৩ কাজীর খেড় নবাই থানাদার দৌহিত্র হরিদাসস্য

সমন্বয়ঃ। ও জুনিদখানীভাবঃ। যথা—বীরভূম নিবাসী বসন্তচৌধুরী তস্য পত্নী জুনিদখাঁ চিরমরামিৎ। তজ্জাত কন্যা মুং কাশীশ্বর সুত হরিহরেণাঢ়া। তথাহি কাশীশ্বর সুত হরিহর ফুলিয়ার মুখটি। ভাল বিয়া ছিল তার জুনিদ খানের বেটি॥ আছিল উত্তমুল মুখ হরিহর। জুনিদ খাঁর হেড়া রুটিতে ভরিলা উদর॥ বল্লভীমেলে—মছান্দখানাঘ্রাত-পুতিনারায়ণ সম্পর্কঃ। সর্ব্বানন্দী মেলে বনমালিখাণীয় বনমালী যবনান্ন ভক্ষণ দোষঃ। বাঙ্গালমেলে—বাবা দোস্তখানী ভাবঃ। গোপাল ঘটকী মেলে ১ গোলাম সমন্বয়ঃ। শ্রীকর পুত্র পরমানন্দে গোলাম সমন্বয়ী বিশ্বেশ সিকদার কন্যা বিবাহঃ। আঠুরা রমাই সুত রাজেন্দ্র হাসন খানস্যিঃ। তথাহি গোপাল গাজিপুরে বাস, আঠুরার সর্ব্বনাশ, হাসন খাঁ এর খায় এড়ারুটি॥ চান্দাই মেলে শ্রীধর হাজরা সমন্বয়ঃ। কাকুৎস্থীমেলে ঃ কাকুৎস্থ মিশ্রে কুবাদ সমন্বয়ঃ। হাওয়ালালখ নক শৌরীপত্নী গ্রহনং। ততঃ হাওয়ালাল খানী। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রথমভাগ)। তখন সমাজের অবস্থা কিরূপ ভীষণ তাহা নিম্নলিখিত দোষ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

অদৃষ্ট প্রসন্ন রায়ের কি কব কথন। দাসুরায় দৌহিত্রী কন্যা জন্মে সুলক্ষণ॥ কোথা হইতে সীতারাম বাড়ীর উপর গেল। বলে ছলে তের দিনের কন্যা বিহা দিল॥ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে পাঁচ পীরের মোকাম। তাহাতে নমাজ পড়েন সাগরদীয়ার শ্যাম। শুকদেব নমাজ পড়েন নম্র করি শির; বেচু রঘু জগন্নাথ মক্কার ফকির॥

নন্দ কিশোর বসিয়াছে উথুড়ার মাঠে। কোথা হইতে রূপরাম সেই খেওয়াঘাটে॥ বারিয়া নিয়া নন্দকিশোর কন্যা বিহা দিল। রাতারাতি রূপরাম বালিগাঁও গেল। বালিগাঁও গিয়া রূপ করিল সন্ধান। গঙ্গারামের সুত দুই করে গঙ্গা স্নান॥ সেই কন্যা ধরিয়া রূপ গলায় দিল মালা। গঙ্গারাম দেখিয়া বলে কি করিলি শালা॥ শালার এমত কর্ম্ম কেহ নাই দেখে। গঙ্গারামের বড়দোষ কুলাচার্য্য লেখে। হড় পাইয়া মনে ভাবে গঙ্গারাম গাঙ্গ। রামগোপাল নষ্ট হেতু চলিলেন বঙ্গ॥ বঙ্গে গিয়া দোহারতে বসিলেন পূজায়। যত ছিল পুষ্পচন্দন দিল শালীর গায়॥ পুত্রবরে রামচন্দ্র সেই কন্যা লয়। আশপাশে হর দোষে কুল হইল ক্ষয়॥"

ব্রাহ্মণের কৌলিন্য এইভাবে সমাজের বুকের উপর তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছে। হিন্দুসমাজ তাহা অবনত শিরে মানিয়া লইয়াছে। সাধারণত দেখা যায় যে-

সমাজে শারীরিক পরিশ্রমের চর্চা বেশী সে সমাজে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের সংখ্যা বেশী এবং যেখানে শারীরিক চর্চা নাই, শুধু মস্তিষ্ক চর্চা, সেখানে কন্যার সংখ্যাই বেশী। এই কারণেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের মধ্যে অন্য সমাজ অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা বেশী। কন্যাসংখ্যা বৃদ্ধিতেই কুলীনের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি করে। মেলবিধি অনুসারে মেল, মুখ, থাক লইয়া কুলীনের প্রকৃতি ও পালটি, এই প্রকৃতিও পালটির গণ্ডীর বাহিরে কুলীনের বৈবাহিক আদান প্রদান চলিবে না। কুল বাঁচাইতে হইলে এক বংশের ত্রিশটি কন্যাকে অন্য বংশের চারিটি পুত্রের সহিতও বিবাহ দিতে হইবে নতুবা কুল থাকিবে না। এইরূপ নানা কারণে বহু বিবাহের উৎপত্তি। মেল, থাক, পর্য্যায়, ভাব ইত্যাদি বাঁধাবাধি নিয়ম থাকায় বিবাহ যোগ্য বয়সে অনেক সময় কন্যার ভাগ্যে বরই জুটে না। কুলভঙ্গের ভয়ে বহু কন্যাকে অভিভাবক মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কুমারী থাকিতেই বাধ্য করিলেন। একদিকে কন্যার বাধ্যতামূলক চির কৌমার্য্য, এই দুই কারণে নানারূপ অনাচার, ব্যভিচার ও গ্লানি সমাজকে গ্রাস করিল। কৌলীন্য প্রথায় অন্যের কথা দূরে থাকুক নিজের পিতা, ভ্রাতা, সহোদরার মধ্যেও জাতিভেদ সৃষ্টি করে। একটি ঘটনার উল্লেখ করা হইল।

সাগরদীয়ার রামেশ্বর ও রমাকান্ত দুই সহোদর ভাই। রামেশ্বর ফুলিয়ার শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া সম্মানিত। মেটেরীর জমিদার কন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি সেই গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। রামেশ্বরের কনিষ্ঠ সহোদর রমাকান্তের পুত্র রাস্তীগ্রামের কন্যা বিবাহ করায় রমাকান্ত কুলে কিছু ছোট হইলেন। রমাকান্ত ছলে বলে দাদার সমান কুলীন হইতে সুযোগ খুঁজিলেন। একদিন প্রলোভন দেখাইয়া রমাকান্ত দাদাকে সঙ্গে করিয়া শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ দর্শনে রওয়ানা হইলেন। শ্রীক্ষেত্র হইতে ফিরিবার সময় দাদাকে উদরপূর্ণ করিয়া প্রসাদী পচা চিড়া খাওয়াইলেন। রামেশ্বর পেটের অসুখে দুর্ব্বল ও অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। রমাকান্ত দাদাকে রাস্তায় ফেলিয়া মেটেরীতে আসিলেন এবং মহাধুমধামে দাদার শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিলেন। শরীর সুস্থ হইলে রামেশ্বর ঘরে ফিরিয়া দেখিলেন যে মহা সমারোহে তাঁহাকে পিণ্ডদান করা হইতেছে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার এই ছলনায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বর দুঃখিত হইলেন। নবদ্বীপের রাজা রমাকান্তকে শাস্তি দিতে মনস্থ করিলেন। রমাকান্ত কিছুদিন পরেই অন্তিম শয্যায় শায়িত হইলেন ও ফুলিয়া গ্রামের নীচে গঙ্গার তীরে আনীত হইলেন। নবদ্বীপাধিপতি তাঁহার পিতৃব্য জামাত যাদবেন্দ্রের এক অবিবাহিত কন্যাকে

লইয়া রমাকান্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। "রাজা বলে এই কন্যা বিয়া কর রমা। রমা সে কন্যারে বলে পুন মা মা॥ তথাপি মহাসমারোহে অন্তিম-শয্যায় শুভ বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। এদিকে রমাকান্তের কুলভঙ্গ ও মৃত্যু হেতু ফুলিয়ায় হাহাকার পড়িয়া গেল। বহু কুলীন এইভাবে পরে অর্থ লোভে বংশজের কন্যা বিবাহ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা ভঙ্গকুলীন বলিয়া পরিচিত হইলেন। প্রথমত, বংশজের কন্যা গ্রহণে কুলীনের কুলভঙ্গ হইত না; বংশজ কন্যার পিতা কুলীনকে কন্যাদান করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। এইরূপে এক এক কুলীন পুত্র শত শত বংশজের কন্যা বিবাহ করিতে লাগিলেন। তখন বংশজ পুত্রেরা বিবাহের জন্য কন্যা পাইতেন না। তখনই ভরার মেয়ের বিবাহ আরম্ভ হইল।

প্রবাসী লিখিতেছেন "অল্পদিন পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে নদীতে নদীতে ভরা (নৌকা) বোঝাই করিয়া ঘাটে ঘাটে মেয়ে ফেরি করিয়া বিক্রয় হইত এবং যে সব ব্রাহ্মণসমাজে বিবাহ যোগ্যা কন্যার অভাব থাকিত, সেই সমাজের ব্রাহ্মণেরা বিবাহার্থ্য সেই সব পিতৃপরিচয়হীনা, অজ্ঞাত কুলশীলা কন্যাদের মধ্য হইতে বাছিয়া ভাবী পত্নী ক্রয় করিত। এই সব কন্যা অন্ত্যজ শূদ্র ও মুসলমান বংশ হইতেও সংগ্রহ হইত কিন্তু কেহই তাদের পিতৃ পরিচয় জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করিত না। তারা ভরার মেয়ে ইহাই তাদের যথেষ্ট পরিচয় বলিয়া স্বীকৃত ছিল।

'বিক্রমপুরের রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজেই ভরার মেয়ের বিয়ে প্রচলিত ছিল। বংশজ কন্যাগণের পণ এত চড়িয়াছিল যে হাজার বারশো ভিন্ন একটি কন্যা পাওয়া যাইত না। মেয়ে দান করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ আত্মীয় সাজিয়া থাকিত। ভরার মেয়ে যে কি পদার্থ, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না, এজন্য প্রথমে কিছুকাল সমাজে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত, শেষে সমুদয় মিটিয়া যাইত। সহস্র টাকার পরিবর্ত্তে ৬০।৭০ টাকা দিলেই একটি মেয়ে পাওয়া যায়, এ সুযোগ কে ছাড়ে? কোনও স্থানেই ভরার মেয়ে বিবাহকারী ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে দূরীকৃত হইত না। যে কোনও জাতির দরিদ্র বিধবা কন্যা অথবা পিতৃ-পরিচয়হীনা কন্যাকে সংগ্রহ করিত, কুপথগামিনী স্ত্রীলোকও সংগৃহীত হইত, কিছুই বাদ যাইত না। এই ভরার মেয়ে বিবাহে অমুক ব্রাহ্মণ ডুলী বেহারার মেয়ে, অমুক ব্রাহ্মণ তাঁতীর মেয়ে বিবাহ করিয়াছিলেন। কোন কোন মেয়ের কথাবার্ত্তায় সে মুসলমান কন্যা ও মুচির কন্যা বলিয়াও বুঝাইত। আমরা

বিক্রমপুরের অনেকের নিকট শুনিয়াছি যে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত ভরার মেয়ে বিবাহ প্রচলিত ছিল।" (মহাভারতমঞ্জরী)। বংশজগণ কন্যা পাইতেন না বলিয়া বাধ্য হইয়া এইভাবে বিবাহ করিতেন। ইহাই হইল যখন বঙ্গের ব্রাহ্মণ সমাজের ইতিহাস তখন আর জাতি ও কৌলিন্যের বৃথা গর্ব্ব করিয়া কি লাভ! চালুনী আর কত কাল সূচকে ঘৃণা করিবে! অন্যদিকে কুলীন ব্রাহ্মণদের মহা সুযোগ। তাঁহারা 'দেবীবরের মেল বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বিবাহ দ্বারা জীবিকা অর্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। মেলচ্যুতির ভয়ে কুলীনগণ কুলীনপাত্রে কন্যাদান করিতে বাধ্য হইতেন। সুতরাং সমাজে পাত্রের অভাব হইল। কুলীন পুত্রগণ সুবিধা পাইয়া বরপণের দাবী করিতে লাগিলেন। সর্ব্বনাশকর পণ প্রথার মূল এইখানে। কথিত আছে একজন কুলীন ব্রাহ্মণের উপর বারোয়ারী পূজার ১২৲ টাকা চাঁদা ধরা হয়। সে ১২৲ টাকা অন্য কোন উপায়ে সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ১২৲ টাকা বরপণে এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া সেই ১২৲ টাকা বারোয়ারীতে চাঁদা দেয়! (বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বিবৃতি)। সাধু ব্যবসায়! সাধু প্রবৃত্তি! সাধু কৌলীন্য! কুলীন সমাজে যে বহু বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল তাহা স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সেই বীর-পুরুষের তেজে সে কুপ্রথা এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ হইতে তিরোহিত হইয়াছে। তিনি হুগলী জেলার, কুলীন ব্রাহ্মণগণের বহু বিবাহের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে লিখিত হইল:—

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, বয়স ৫৫ বর্ষ, বিবাহ ৮০ টি। রঘুনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, বয়স ৪০, বিবাহ ৩০টি। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ২০, বিবাহ ১৬টি। পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বয়স ৫৫, বিবাহ ৬২টি। আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ১৮, বিবাহ ১১টি। যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ২২, বিবাহ ১৫টি। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বয়স ৬০, বিবাহ ৫০টি। ভগবান চট্টোপাধ্যায়, বয়স ৬৪, বিবাহ ৭২টি। রামময় মুখোপাধ্যায়, বয়স ৫০, বিবাহ ৫২টি।" (বর্ত্তমান সমাজের ইতিবৃত্ত)। কুলীনগণ এইরূপে বহু বিবাহ করিয়া স্ত্রীগণকে শ্বশুর বাড়ীতেই রাখিতেন। অনেকে এক এক শ্বশুর বাড়ীতে ২।১ দিন করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াই জীবন কাটাইয়া দিতেন। বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে বাড়ীতে আনিয়া যদি ভরণ পোষণই করিতে হইল তবে আর কৌলিন্য কিসের, ইহাই ছিল তাদের বদ্ধমূল ধারণা।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে মেল বন্ধন না থাকিলেও দোষের প্রাবল্য ছিল।

দোষ বা অবসাদ প্রাপ্ত কুলীনগণ উত্তম কুলীনের সহিত সংস্পর্শ করিলে তাঁহাদের দোষ (অবসাদ) বিদূরিত হয়। অবসাদ প্রাপ্ত কুলীনগণ যে যে থাকে বিভক্ত হন তাহাকে পটী বলে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে এক্ষণে ৮টি পটী প্রসিদ্ধ আছে। পটী মেলেরই অনুরূপ। আলিয়াখানী পটীতে যবন সংসর্গ আছে। কুতব খানী পটীতে দেখা যায় কুতব খাঁ নামে এক মুসলমান যে কন্যাকে হরণ করিয়াছিল তাহাকে মধুরা মৈত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। ভূষণা পটীর ব্রাহ্মণগণ নীচ জাতির স্ত্রীর সংশ্রবে দুষ্ট হইয়াছেন। (বর্ত্তমান সমাজের ইতিবৃত্ত-শ্রীভাগবতচন্দ্র দাশ)। লালবিহারী কবি ভূষণ লিখিয়াছেন, "বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে কুলীনের পটী বন্ধন এবং রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজের কুলীনের মেলবন্ধনের মূলেও দুই এক স্থানে ভিন্ন জাতি সংশ্রম সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।" বাঙ্গালী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ প্রচণ্ড খাঁ ভাদুড়ী অথবা তাঁহার পুত্র পশ্চিম দেশীয় রোহিলাখণ্ড নিবাসিনী এক ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সমাজে রোটিলা পটী কুলীনের উদ্ভব হইয়াছে। আর এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জনৈক মৈত্র একটী পরমা সুন্দরী মুসলমান কন্যাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নাম ভূষণা রাখিয়া সেবাদাসী করিয়াছিলেন, এজন্য বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভূষণা পটী কুলীনের উৎপত্তি হইয়াছে। ডাকাত বেণী রায়ের দলের ব্রাহ্মণেরা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বেণী পটীর কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। বারেন্দ্র শ্রেণীর নিরাবলী পটীর কুলীন দোষশূন্য। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" বলেন মধুরা চৌধুরীর কন্যাকে কুতব খাঁ নামা সোয়ারে হরণ করিয়া লয়। মধুরা চৌধুরী কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া মৃত্যুঞ্জয় মৈত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেন। ইহাতেই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলীন সমাজে কুতবখানী পটী হয়। কামদের ভট্টের পাঁচ কন্যাকে বাদশাহী সোয়ারে ঘেরিয়া লইয়া যায়। কামদেব ভট্ট ঐ পাঁচ কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া মৈত্র সান্ন্যাল প্রভৃতিকে দান করেন।"

"যদিও বর্ত্তমান ইংরাজী সভ্যতায় কৌলিন্য প্রভাব অনেকটা হ্রাস হওয়ায় আর কুলনীন বা স্বকৃত ভঙ্গের পূর্ব্বেবৎ সম্মান বা সমাদর নাই, কিন্তু এখনও যশোর জেলায় কালীপুর, লক্ষ্মীপাশায়, ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর অঞ্চলে, বাখরগঞ্জে কলসকাঠীতে এবং ফরিদপুর জেলায় খালিয়া, আমগ্রাম কালামৃধা প্রভৃতি স্থানে গঙ্গোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় বা চট্টোপাধ্যায় গোষ্ঠীর মধ্যে এক এক জনের ৫০।৬০টি পর্য্যন্ত বিবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল

ইহাই নহে ; অনেক কুলীনের তাহা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠাপত্নী বিদ্যমান। কোথাও চারি মাসের কন্যা ৬০।৬৫ বয়স্ক বৃদ্ধের করে অর্পিত হইয়া থাকে। অনেক পত্নীর হয়ত বিবাহ বাসরের পর পতিমুখ দর্শন ঘটে না। আবার ঐ সকল কুলীনের ঘরে বহু সংখ্যক প্রৌঢ়া কন্যার আজও বিবাহ হয় নাই" (শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু)। "পূর্ব্ববঙ্গে আসিলে এবং পূর্ব্ববঙ্গীয় সমাজের প্রতি তাকাইলে, তবেই এখনও প্রত্যক্ষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় যে, কৌলীন্য কি ভীষণ মূর্ত্তি এবং এখনও তাহা কিরূপ পূর্ণভাবে বিরাজমান। এখানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক রাত্রির মধ্যে চারি মাস হইতে সপ্তাত বর্ষ বয়স্কা (পাড়ার সমস্ত সম মেলের) কন্যা শ্বেতকেশ লোলচর্ম্ম এক বৃদ্ধের করে অর্পিত হইতেছে, অথবা এক সাতবর্ষ বয়স্ক বালকের স্কন্ধে ৩০ বর্ষ হইতে ৬০ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়সের ৮।৯ টি সহধর্ম্মিনী চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানেই কেবল কন্যা জন্মিবামাত্র অবধারিত হইতে পারে যে, ইহজন্মে ইহার ভাগ্যে বিধাতা বিবাহ সংস্কার লিখেন নাই ; এখানেই কেবল প্রতি ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে যেমন একদিকে শত শত কুলীন কন্যা বিবাহ অভাবে বৃদ্ধা, তেমনি অন্যদিকে আবার অন্যরূপ অনুপাতে কত কত শ্রোত্রীয় ও বংশজের বিবাহ অভাবে বংশলোপ পাইতে বসিয়াছে। তাহার পর এই সকলের পরিণাম স্বরূপ যে নৈতিক পাপের চিত্র, তাহাতে পটক্ষেপ করাই উচিত।" (শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। এই কুসংস্কারে ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী কৌলীন্য ধন্য তোমার মহিমা! এই কৌলীন্যের ওজুহাতে কত ব্যক্তি নিজেকে ব্রহ্মার প্রপৌত্র বলিয়া মনে করিতেছে। ইহাই বঙ্গে ব্রাহ্মণ বংশবৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল পাঁচজন কিন্তু তাঁহাদের বংশধরদের সংখ্যা বর্ত্তমানে দশ লক্ষ। অন্যদিকে হিন্দুর সংখ্যা এক সময় ছিল ৬০ কোটি কিন্তু বর্ত্তমানে ২৬ কোটি। এইরূপ নানা রহস্যের ভিতর দিয়াই কোন জাতি বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস পায়।

বল্লালের চণ্ডনীতি

দুই ব্যক্তি বাংলাদেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে—বল্লালসেন ও রঘুনন্দন। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে এই দীপ্তিমান মহাপুরুষদ্বয়ের কীর্ত্তি বাঙ্গালীর স্মৃতিপটে উজ্জ্বল থাকিবে। লক্ষ লক্ষ নরনারীর বক্ষে ইঁহারা যে ঘৃণা, বিদ্বেষ, অপমান ও হিংসার কালাগ্নি জ্বালাইয়াছিলেন আজও তাহা তিল তিল করিয়া হিন্দু সমাজকে দগ্ধ করিতেছে। দুই মহাপুরুষই নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ বল্লাল সেন রাজা হইলেন। ভট্টপাদ সিংহগিরি তাহাকে শৈব করিলেন। বঙ্গাধিপতি বল্লাল সেন বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হলায়ুধ ও উমাপতি নামক দুই ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হন। হলায়ুধ বল্লালের মন্ত্রী উমাপতি তাঁহার পঞ্চরত্নের অন্যতম রত্ন। এই দুই ব্রাহ্মণের হস্তের ক্রীড়া পুত্তলী হইয়া বল্লাল ছলে বলে কৌশলে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্থাপনে সমুদ্যত হইলেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত অত্যাচার ও ব্যভিচারে দেশবাসী জর্জরিত হইল। রাজা অত্যাচারী হইলে চিরদিনই এইরূপ হয়। ব্রাহ্মণের বশ্যতা স্বীকার করার নামই তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও রাজ ধর্ম্ম। বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রজাবৃন্দ আহার বিহার বিবাহাদি সর্ব্ব কার্য্যেই একতা ও প্রেমে আবদ্ধ ছিল, তাই তখন দেশ স্বাধীন ছিল। বল্লাল এই ধর্ম্ম রহিত করিয়া দ্বেষ ঈর্ষা স্বার্থপূর্ণ তেজোদ্দীপক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইলেন। ফলে দেশবাসী শত সহস্র জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত হইল, আত্মকলহ গৃহবিবাদের সৃষ্টি হইল, জাতি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইল। বিদেশী এই সুযোগে বাঙ্গালা আক্রমণ করিল, হিন্দুস্বাধীনতা লোপ পাইয়া মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হইল। আনন্দ ভট্টকৃত বল্লাল চরিতে দেখা যায়—নিশ্চিতং জারজং সোঽপি দুষ্কর্ম্ম মন্দবিগুথা। চণ্ডাল ডোম কন্যাদৌ রতোঽসেযৌ সাধু পীড়কঃ॥ অর্থাৎ বল্লাল বিজয় সেনের জারজ পুত্র দুষ্কর্ম্ম পরায়ণ, সাধু পীড়ক, ডোম কন্যা ও চণ্ডাল কন্যায় আসক্ত ছিলেন। তিনি চালুক্য রাজকন্যা রমাদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার রক্ষিত ব্রাহ্মণগণের প্ররোচনায় তিনি বৌদ্ধ প্রজাগণকে সেইসব ব্রাহ্মণের শিষ্য ও সেবক শ্রেণীভুক্ত করিতে আইন জারি করিয়া দেন। প্রজাগণ

এত সহজেই রাজ আদেশে ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল না। দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রজাগণ রাজার সহিত সহযোগিতা বর্জন বা নন-কোঅপারেশন করিলে রাজা বৌদ্ধধর্ম্মকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যাহারা তাঁহার রাজ-আইন অমান্য করিয়া ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া রহিল—তিনি তাহাদিগকে পাতিত্যের দণ্ড দিলেন, সকলকেই পতিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বল্লাল প্রদত্ত রৌপ্যমুদ্রার মহিমায় শাস্ত্রের নামে জালিয়াতী করিয়া প্রচার করিতে লাগিল—ব্রাহ্মণ বাদে বাকী সকলেই হীন, নীচ, পতিত, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য ও বর্ণসংকর। ব্যাস সংহিতার নামে প্রচার করা হইল : "বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ। বণিক্ কিরাত কায়স্থ মালাকার কুটুম্বিনঃ॥ বরট মেদচণ্ডাল দাসশ্বপচ কোলকাঃ। এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যেচ গবাশনা॥ এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্ক বীক্ষণম্। (১ম অধ্যায়)। অর্থাৎ সূত্রধর, নাপিত, গোপ আশাপ কুম্ভকার, বণিক, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বী, মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ ও কোল জাতি—ইহারা অন্ত্যজ এবং গোখাদকদের ন্যায় অব্যবহার্য্য, ইহাদের সঙ্গে বার্ত্তালাপে স্নান করিতে হয় এবং দেখিলে সূর্য্য দর্শন করিতে হয়।" "পীড্যমানা প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ। (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১।৩৩৬) অর্থাৎ কায়স্থ কর্ত্তৃক অত্যাচারিত প্রজাগণকে রক্ষা করিবে। "কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং ন খাদিতং। তত্র নাস্তি কৃপাতস্য অদন্তৈব কারণম॥ স্বর্ণকার স্বর্ণ বণিক্ কায়স্থশ্চ ব্রজেশ্বর। নরেষু মধ্যেতে ধূর্ত্তাঃ কৃপাহীনাঃ মহীতলে॥ (ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, ৮৫ অধ্যায়) অর্থাৎ কায়স্থ মাতৃজঠরে থাকিয়া মাতার মাংস খায় না কেন? সেখানেও তাহার দয়া নাই। তবে দাঁত উঠে নাই ইহাই কারণ। হে ব্রজেশ্বর! স্বর্ণকার স্বর্ণবণিক ও কায়স্থ—ইহারাই জগতে ধূর্ত্ত ও নিষ্ঠুর।" এইরূপ নানারূপ ছড়া, শ্লোক ও গল্প লিখিয়া বল্লালের অন্নদাস পণ্ডিতেরা ঋষি ও শাস্ত্রকারদের নামে দেশে দেশে জাতি বিদ্বেষ প্রচার করিয়া অনর্থ সৃষ্টি করিলেন। বলদেব ভট্ট ঘোষণা করিলেন ব্রাহ্মণ বাদে সমস্ত অব্রাহ্মণই সঙ্কর বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। "পরশুরাম সংহিতা" নামক একখানি অর্ব্বাচীন গ্রন্থে শূদ্র-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণেরা প্রচার করিলেন "গোপের ঔরসে বারুজীবি, বারুজীবির ঔরসে তেলী, তেলীর ঔরসে কর্ম্মকার, কর্ম্মকারের ঔরসে মালাকার, মালাকারের ঔরসে পট্টীকার, পট্টীকারের ঔরসে কুম্ভকার, কুম্ভ-কারের ঔরসে কুবেরী এবং কুবেরীর ঔরসে নাপিতের জন্ম হইয়াছে।" মনু ও

মহাভারতের নামে প্রচার করা হইল ক্ষত্রিয়-স্বামী ও ব্রাহ্মণী-স্ত্রীতে সূত জাতির জন্ম, বৈশ্য-স্বামী ও ক্ষত্রিয়া-স্ত্রীতে মাগধ জাতির জন্ম এবং বৈশ্য-স্বামী ও ব্রাহ্মণী-স্ত্রীতে বৈদেহ জাতির জন্ম। (মনু ১০।১১ ও মহাভারত, অনুশাসন ৪৮।১০)। কিন্তু পৌরাণিক দৃষ্টান্তে অন্যরূপ দেখা যায়। পিতা জমদগ্নি ব্রাহ্মণ, মাতা রেণুকা ক্ষত্রিয় কন্যা ; পুত্র জন্মিলেন পরশুরাম। তিনি সূত না হইয়া ব্রাহ্মণই হইলেন। কেহ প্রচার করিলেন শূদ্র পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতাতে চন্ডালের জন্ম কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তে দেখা যায় মগধের রাজা বিন্দুসার শূদ্র, বিবাহ করিলেন এক ব্রাহ্মণীকে, পুত্র হইলেন জগদ্বিখ্যাত ক্ষত্রিয় রাজা অশোক। অশোক পন্ডিতদের শ্লোকের প্রভাবে চন্ডাল হন নাই।

শাস্ত্রে কিন্তু বর্ণসঙ্কর তত্ত্ব অন্যরূপ। জিনিষটি প্রচারিত হইলে আর কেহ জাতিবিশেষের উপর মিথ্যা লাঞ্ছনা আরোপ করিতে সাহসী হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিলেন "স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণ-সঙ্করঃ।" অর্থাৎ হে বার্ষ্ণেয়, স্ত্রীরা দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়।" মহর্ষি মনু বলিলেন "ব্যাভিচারেন বর্ণানাম বেদ্য বেদনেন চ। সকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।" (মনু ১০।২৪) অর্থাৎ চারি বর্ণের মধ্যে ব্যাভিচার ঘটিলে, বিবাহের অযোগ্যা কন্যাকে বিবাহ করিলে এবং স্ব স্ব বর্ণোচিত কার্য্য ত্যাগ করিলে বর্ণ সঙ্কর উৎপন্ন হয়।" প্রথমত, সর্ব্ব জাতির মধ্যেই সর্ব্বদা অল্প বেশী ব্যাভিচার চলে, সুতরাং সর্ব্ব জাতিতেই বর্ণ সঙ্করের অস্তিত্ব আছে। দ্বিতীয়ত, কৌলিন্যপ্রথা, পণপ্রথা, বৃদ্ধবিবাহ, বাল্যবিবাহ, একাধিক বিবাহ ইত্যাদি নানা কারণে সর্ব্ব জাতির মধ্যেই বিবাহের অযোগ্য স্বামী স্ত্রীতে বিবাহ কার্য্য চলিতেছে, সুতরাং সর্ব্ব জাতিতেই বর্ণসঙ্কর বিদ্যমান। তৃতীয়ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের মধ্য হইতে অনেকেই স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্ম্ম পরিহার করিয়াছেন। সুতরাং সকল বর্ণের মধ্যেই বর্ণসঙ্কর দুষ্প্রাপ্য নহে। যে সব ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম বেদপাঠ, ব্রহ্মবিদ্যা, যজন, যাজন, ধর্ম্ম প্রচার ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া কুক্কুর বৃত্তি চাকুরী গ্রহণ করিয়াছেন, ওকালতি, কুলীগিরি, ডাক্তারী, জমিদারী বা পাচকগিরি গ্রহণ করিয়াছেন মনুর মতে তাহাদের গৃহেও বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইতেছে। মনুর মতে বর্ণসঙ্করে ধারা দেশ আচ্ছন্ন।

হিন্দুর জাতিতত্ত্ব অতিব রহস্যময়। যাঁহারা দেশ শাসন করিয়াছেন বা রাজার মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন তাঁহাদের বংশ ইতিহাসই উদ্ধার করা কঠিন হইয়াছে,

প্রজা জনসাধারণের বংশ ইতিহাস সম্বন্ধে তো কোন কথাই নাই। রাজা গণেশ, রাজা আদিশূর ইঁহারা ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয় না শূদ্র এ পর্য্যন্তও তাহার মীমাংসা হয় নাই। তবুও বিভিন্ন সমাজ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা গিয়াছে। যখন বর্ণ গুণ কর্ম্ম স্বভাব অনুসারে না হইয়া জন্ম ও বংশগত হইল তখনই নানারূপ খন্ড বিখন্ড সমাজ গঠিত হইল। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ আট শত ভাগে বিভক্ত। একে অন্যের হস্তে ভোজন করে না। দাক্ষিণাত্যে বহু ব্রাহ্মণ নিজের মাতা বা স্ত্রীর হাতেও অন্নজল গ্রহণ করে না। ইহাই তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। সব দেশেই সব শ্রেণীর মধ্যে এই অন্ধ কুসংস্কারের রাজত্ব চলিতেছে। বঙ্গদেশেও জাতি সম্বন্ধে বহু মিথ্যা ধারণা চলিতেছে। 'বৈদ্যগণ' বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে উৎপন্ন। ইঁহারা বৈশ্যও নহেন শূদ্রও নহেন। ইঁহারা সংখ্যায় অত্যল্প হইলেও বিদ্যাবুদ্ধি পান্ডিত্যে এখনও ব্রাহ্মণাদি সর্ব্বজাতির উপরে। 'কায়স্থগণ' ছিলেন ক্ষত্রিয়। রাজকার্য্য ও মন্ত্রিত্বে চিরদিনই ইঁহারা অগ্রণী। ব্রাহ্মণের আহ্বানে যাঁহারা পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে প্রবেশ করিলেন তাঁহারাই "গোপমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী। কুলাল কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥" গোপ, মালী, তৈলী, তন্ত্রী, মোদক, বারুজীবী, কুম্ভকার ও নাপিত এই নয়টি সমাজ নবশায়ক বা নবশাখ নামে পরিচিত। ইঁহারা কেহই শূদ্র ছিলেন না। গোপ ও বারুজীবির মধ্যে একদল ক্ষত্রিয় ও একদল বৈশ্য ; কর্ম্মকারদের কেহ ব্রাহ্মণ এবং কেহ ক্ষত্রিয় ছিলেন ; নাপিতেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ, পৌরহিত্যের কোন কোন অংশ ইহারাই গ্রহণ করিতেন, মালী, তৈলী, তন্ত্রী, মোদক ও কুম্ভকার ইঁহারা সকলেই পূর্ব্বে বৈশ্য ছিলেন। বল্লাল দ্বিজত্ব উঠাইয়া দিয়া নবশাখগণকে শূদ্র শ্রেণীভুক্ত করেন এবং সেই হইতেই ইঁহারা আইনের ভয়ে যজ্ঞোপবীত বর্জ্জন করিয়াছেন। যে সব তৈল ব্যবসায়ী রাজার আদেশানুসারে তখনও বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন না তাঁহারাই তেলী বা কলু নামে রাজার নিগ্রহ পূর্ণভাবে ভোগ করিতে লাগিলেন, সে সব মালী বল্লালের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নিকট মস্তক কিছুতেই অবনত করিলেন না, বল্লাল তাঁহাদের পুষ্পোদ্যান রক্ষণাবেক্ষণের অনায়াস সাধ্য জীবিকা অপহরণ করিয়া ক্ষেত্রে শস্য রক্ষণাবেক্ষণের আয়াস সাধ্য জীবিকা দান করিলেন। তাঁহারাই এখন ভুঞমালী, ভুঁইমালী বা মালী নামে পরিচিত! মাহিষ্যগণ ছিলেন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। মাহিষ্মতী পুরী নির্ম্মাতা হৈহয় বংশীয় মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ইঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ। ব্রাহ্মণ সমাজের সহিত ইঁহাদের

বহুকালব্যাপী যুদ্ধ চলিয়াছিল। তাহাতে উভয় পক্ষেই অনেকে হতাহত হন। ক্ষত্রিয়পক্ষের নেতা ছিলেন কীর্ত্তবীর্য্য এবং ব্রাহ্মণ পক্ষের নেতা ছিলেন পরশুরাম। এই রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় বহু ক্ষত্রিয় আত্মগোপন করিয়া ছদ্মবেশে দেশের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন এবং কৃষিকার্য্য, নৌকাচালনাদি নানা বৃত্তি গ্রহণ করেন। ইহাদের একদল লুপ্ত মাহিষ্য বা পাটনী নামে পরিচিত। একদল ক্ষত্রিয় নিজেকে দাস রূপে পরিচয় দিতে লাগিলেন, কেহবা নিজেকে কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচয় দিতে থাকিলেন। বল্লালের সময় পর্য্যন্তও ইঁহাদের যজ্ঞোপবীত ছিল। বল্লালই রাজ-আইনে ইহাদের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করেন। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশে উৎপন্ন। পৌণ্ড্র শব্দেরই অপভ্রংশে পোদ। মহাভারতের যুগে ইহারাই সমগ্র বঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ইহারাই রাজধানী স্থাপন করেন। ইহাদের একদল এখনও নিজেকে পুঁড়ো বলিয়া পরিচয় দেন। উগ্র ক্ষত্রিয়গণ এককালে সমগ্র অঙ্গদেশের রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। পাটলীপুত্রে ও তাম্রলিপ্তে ইহারা রাজধানী স্থাপন করেন। ইহাদের নাম অপভ্রংশে উগ্র হইতে আগুরী হইয়াছে। বাগ্দী বা ব্যগ্র ক্ষত্রিয়গণের রাজধানী ছিল বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে। সমগ্র রাঢ়দেশে ইহাদের প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল। রাঢ়দেশ হইতে একদল ক্ষত্রিয় বল্লালের পক্ষাবলম্বী হইয়া মণিপুর যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর তাঁহাদের অনেকে রাঢ়দেশে আর ফিরিলেন না। তাঁহারা পূর্ব্ব শ্রীহট্টের নানাস্থান দখল করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা কোপাদার বা রাঢ়ী কায়স্থ নামে পরিচিত। এখনও তাঁহাদের মধ্যে ক্ষাত্রবীর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কোচ বা খস ক্ষত্রিয়গণ উত্তরবঙ্গে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। পাঞ্চালবংশীয় ক্ষত্রিয়েরাও ইহাদের নিকট পরাভূত হন। পঞ্চনদের বহু রাজবংশীয় ক্ষত্রিয়, মল্লবীর ও যোদ্ধা বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ রাজবংশী নামে, কেহ মল্ল ক্ষত্রিয় বা মল্লক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইলেন। সৌরাষ্ট্র দেশের শুক্লী বা শোলাঙ্কী রাজপুতগণ মুসলমানের অত্যাচার হইতে বাঁচিবার জন্য বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। রাজপুতানার বহু রাজু বা রাজপুত ক্ষত্রিয় পাঠান যুগে এদেশে আগমন করেন। বল্লালের আত্মম্ভরিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়া অন্য একদল ক্ষত্রিয় বনে-জঙ্গলে নির্ব্বাসিত হন। তাঁহাদের নাম হইয়াছিল বল্লালারি ক্ষত্রিয়। ইহারই পরে বল্লারি, বড়ারি বা বড়হাড়ি নামে আখ্যাত হন। যদুবংশের একদল ক্ষত্রিয় রাঢ়দেশে নিজেকে কৃষ্ণবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতে থাকেন। তাঁহারই পরে কৃষ্ণাই, কিনাই বা কোনাই আখ্যা

প্রাপ্ত হন। একদল বৈশ্যকে বল্লাল অন্যায়ভাবে বঙ্গদেশের বাহিরে মগধে নির্ব্বাসিত করেন। কিছুদিন পর মগধ হইতেও তাঁহারা নির্ব্বাসিত হন। ইহারা নিরুপায় হইয়া বঙ্গ ও বিহারের সীমান্তে বাস করিতে থাকেন। ইহাদেরই বর্ত্তমান নাম বাহিরী বা বাউড়ী। বৌদ্ধযুগের একদল সন্ত, সাঁই বা সাধু বল্লালের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বিহারের পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পার্ব্বত্য জাতির অনেকেই তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পরে সান্তাল, সাঁইতাল বা সাঁওতাল নামে খ্যাত হয়। ধান যব গোধুম-দাল-কলাই বিক্রেতা খন্দবণিক বা খন্দ সাহাগণ ছিলেন বৈশ্য। শঙ্খনির্ম্মিত অলঙ্কার বিক্রেতা শাঁখারী বা শঙ্খবণিক, শুণ্ডাকৃতি যন্ত্র হইতে প্রস্তুত শুণ্ড-মদ্য বিক্রেতা শৌণ্ডিক বা সুরাবণিকগণও ছিলেন বৈশ্য। এইরূপ কাংস্যবণিক বা কাঁসারী, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিকগণও বৈশ্য ছিলেন। বল্লাল ইঁহাদেরও যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া শুদ্র বলিয়া ঘোষণা করেন। সূত্রগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ। এইরূপে বল্লালের অত্যাচারে তেওর, জালিক, রজক, দুলে, বেহারা ও কেওরা প্রভৃতি অনেকেই বৈশ্যবংশে জন্মিয়া শূদ্রত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। বল্লাল যাহাদিগকে শুদ্র করিলেন তাহাদের গৃহে পৌরহিত্য করিতেও ব্রাহ্মণকে নিষেধ করিয়া দেন। কিন্তু যে সব উদার হৃদয় ত্যাগী ব্রাহ্মণ রাজ-আদেশ অমান্য করিয়া তাহাদের গৃহে পূজা পাঠ করিতে গিয়াছিলেন বল্লালের বিচারে তাঁহারা কঠোর দণ্ড পাইলেন। এইসব পুরোহিতের নামই বর্ত্তমানে বর্ণব্রাহ্মণ। নাথ বা যোগীরা বৌদ্ধতন্ত্র মতে শিবপূজা করিতেন। তাঁহারা ছিলেন শৈব পুরোহিত। পুরোহিত বলদেব ভট্টের পরামর্শে বল্লাল তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া শিবোত্তর সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। একদল ব্রাহ্মণ পুরোহিত বৌদ্ধদের পঞ্চশিলা ও ধর্ম্মরাজের পূজা করিতেন। বল্লাল তাহাদের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া লোকালয় হইতে বহিষ্কার করেন। পশ্চিমবঙ্গের বহুস্থানে এখনও ইহাদের দ্বারা গৃহস্থেরা গ্রামের বাহিরে মাঠের মধ্যে পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ ভয়ে চুপে চুপে ধর্ম্মরাজের পূজা করাইয়া লন। ইহারা বর্ত্তমানে ধম, ডম বা ডোম নামে আখ্যাত। বিশ্বামিত্র ঋষির বংশধর একদল বৌদ্ধ হইবার পরেও ব্রাহ্মণাচার কিছু কিছু রক্ষণ করিতেন তাঁহারাই ঋষি, রোহিদাস বা মুচি নামে খ্যাত। যে সব ব্রাহ্মণের সহিত প্রতিযোগিতায় বল্লালের পুরোহিতেরা পরাভব স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহারাই বর্ত্তমানে নমঃশূদ্র নামে পরিচিত। বল্লালের অত্যাচার, হিংসা ও নীচতায় বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল। দ্বিজবর্ণের

যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া অনেককে তিনি করিলেন শূদ্র এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী বহু শূদ্রকে তিনি দিলেন ব্রাহ্মণত্ব। বল্লালের অত্যাচারের এইখানেই শেষ নয়। ভ্রষ্ট চরিত্র বল্লাল এক বিবাহিতা ডোম কন্যাকে অপহরণ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং তাহার পাক স্পর্শ ব্যাপারে হিন্দু সমাজের সমাজ-পতিগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই ডোম একরূপ পার্শ্বত্যজাতি বিশেষ। তাঁহার এই নারীহরণ ও ব্যভিচারের পক্ষপাতী হইয়া যে সব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সমাজপতি পাকস্পর্শে ভোজন করিয়াছিলেন তাঁহারা কুলীন উপাধি লাভ করিলেন। কবিবর যদুনন্দন কৃত 'ঢাকুরে' লিখিত আছে "একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে॥ ত্যজিয়া বিপিন রাজা গেলা লোকালয়ে। তথায় বসতি করে ডোমের আশ্রয়ে॥ সেই রাত্রি তথায় রহিল উপবাসী। মিলিলেক ডোম-কন্যা প্রাতঃকালে আসি॥ বিবাহ করিব বলি লৈয়া আইলা ঘরে। যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা করে॥ যদি কালক্রমে রাজা শুনে নিন্দা বাণী। সর্ব্বস্ব হরিয়া তারে তাড়ান তখনি॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনি করায় বিচার। শাস্ত্রমতে কার্য্য করি কি দোষ আমার॥ "পণ্ডিতেরা স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" বলিয়াই পাঁতি দিয়াছিলেন এবং সেই কন্যার হস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন অথচ রাজানুগ্রহে জাতিচ্যুত হন নাই। অন্যদিকে বিরোধিতা করিয়া শত শত হিন্দু লাঞ্ছিত ও সমাজচ্যুত হইলেন।

বৈশ্য সুবর্ণবণিক সমাজের নেতা বল্লভানন্দ ও শ্রীবিন্দ পাইনকে লক্ষ্য করিয়া বল্লালসেন বলিলেন "অদ্যাবধি ক্রিয়াহীনানাং বণিজাং যজ্ঞোপবীত ধারণং ব্যর্থং, এতেষাং ক্রিয়াভাবাৎ শূদ্রত্বং জাতম্"। অর্থাৎ আজ হইতে এই ক্রিয়াহীন বণিকদের যজ্ঞোপবীত ধারণ ব্যর্থ, ক্রিয়াভাবে ইহাদের শূদ্রত্ব ঘটিয়াছে।" কিছুদিন পূর্ব্বে বল্লাল বল্লভানন্দের ধনরত্ন আত্মসাৎ করিতে না পারিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "যদি দুঃশীলান্ সুবর্ণ বণিজঃ অধমজাতীয়ানাং মধ্যে ন গণয়িষ্যামি বল্লভানন্দস্য দুরাত্মনঃ সমুচিত দণ্ড বিধানং ন করিষ্যামি তদা গোব্রাহ্মণ যোষিদাদি ঘাতেন যানি পাতকানি ভবিতব্যানি তানি মে ভবিষ্যন্তি॥" অর্থাৎ যদি দুঃশীল সুবর্ণ বণিক দিগকে অধমজাতির মধ্যে গণ্য করিতে না পারি যদি দুরাত্মা বল্লভা নন্দের সমুচিত দণ্ড বিধান করিতে না পারি তবে গো-ব্রাহ্মণ স্ত্রী আদি হত্যায় যত পাপ হয় আমার সেই সব পাপই হইবে।" বল্লাল প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার বহু বিস্তৃত অত্যাচারের নিদর্শন মাত্র।

রঘুনন্দনের ভেদনীতি

বল্লালের চণ্ডনীতির কষাঘাতে ও কৌলিন্যের ব্যর্থ দাপটে অব্রাহ্মণ হিন্দু-নরনারী জর্জ্জরিতই হইয়াছিল কিন্তু হীন বল হয় নাই। রাজশক্তির অত্যাচার অবিচার যতই চলিল নির্যাতিত গণশক্তির প্রাণে রুদ্ধ দাবাগ্নি ততই জ্বলিয়া উঠিল। হিন্দু রাজত্ব শেষ হইয়াছে, মোছলমানী শাসন আমলে নবদ্বীপে ভঙ্গ কুলীনের গৃহে আবির্ভূত হইলেন স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন। সমাজ রক্ষার অছিলায় তিনি অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব লিখিলেন। সেই নব্য স্মৃতির বজ্রবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া হিন্দু সমাজ জড় ও পঙ্গু হইল। বল্লাল প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য প্রথায় হিন্দু সমাজের রক্তমাংস মেদমজ্জা নিঃশেষ হইয়াছিল, এইবার রঘুনন্দন অবশিষ্ট জীর্ণ কঙ্কাল চর্ব্বণ করিতে ভেদনীতির আশ্রয় লইলেন। ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্থাপনে ব্রত হইয়া তিনি ঘোষণা করিলেন "যুগে জঘন্যে দ্বেজাতী ব্রাহ্মণ শূদ্র এবাহি" অর্থাৎ জঘন্য কলিযুগে মাত্র দুইটি জাতি আছে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। মুসলমান যুগে হিন্দু সংস্কৃত ভাষাকে উপেক্ষা করিয়া যখন আরবি ও পার্শী ভাষা শিক্ষায় ব্যস্ত, তখন এই সুযোগে রঘুনন্দন শাণিত লেখনীর আঘাতে হিন্দুসমাজের বাহু ঊরুকে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে ছেদন করিলেন। মস্তকের সঙ্গে রহিল পদ, ব্রাহ্মণের সঙ্গে রহিল শুধু শূদ্র। যে সমাজ দেহে ক্ষত্রিয় বা প্লীহা যকৃত পাকস্থলী হৃৎপিণ্ডাদি নাই সে দেহ জীবিত নয়, মৃত। এই করিয়া রঘুনন্দনই প্রথমে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মস্তকে কুঠারাঘাত করিলেন—ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় কীর্ত্তি। সাধারণ দেশবাসীর চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া রঘুনন্দন নির্ম্মম কসাই বা জল্লাদের মত সমাজকে হত্যা করিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের ঘূর্ণীপাকে বৈদ্য কায়স্থ নরশাখ হইতে মুচি মেথর ডোম মুদ্দাফরাস সকলেই শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইল। দেশ হইতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শক্তি নিঃশেষ হইল। দেশরক্ষা করে কে? দেশের ধনৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি করে কে? এইবার ব্রাহ্মণ-পুরোহিত শূদ্র জাতিকে শোষণের জন্য নানা জাল বিস্তার করিলেন। ব্রাহ্মণ এইবার তাঁহার বিশ্বগ্রাসী বুভুক্ষা ও লোলিহান জিহ্বা লইয়া যজমানের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে ব্যস্ত। ব্রাহ্মণের ক্ষিপ্ত উদরে যে ক্ষুধার অনল জ্বলিয়া উঠিল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আহুতি দিলেও তাহা নির্ব্বাপিত হইবার নয়। রাজাকে রাজস্ব প্রদান প্রজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণের রাজস্ব জন্মের পূর্ব্ব হইতে মৃত্যুর পরপারেও আদায় হইতে চলিল। বিবাহ, পঞ্চামৃত,

সাধভক্ষণ, নামকরণ, অন্নপ্রাসন, চূড়াকরণ, পুষ্করিণী-খনন, গৃহ প্রবেশ বিদেশযাত্রা সর্ব্বকার্যেই ব্রাহ্মণ রাজস্বের জন্য উপস্থিত। যজমান শ্মশানঘাটে চলিয়াছে সেখানেও ব্রাহ্মণের রাজস্ব। যজমান মৃত মাতা পিতার বা পুত্র কন্যার শোকে সমাচ্ছন্ন, ব্রাহ্মণ চৌদ্দ পুরুষের পিণ্ড দানের ফর্দ্দ ধরিয়া শোকাতুর যজমানের মোহ ও শোকের অবসরে যজমানকে লুণ্ঠন শুরু করিলেন। শূদ্র বিশ্বাস করিতে লাগিল ব্রাহ্মণের হাতেই স্বর্গ এবং ব্রাহ্মণের হাতেই নরক, ব্রাহ্মণের নিকট পাঁতি কিনিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সব পাপ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। এদিকে ব্রাহ্মণ দেখিলেন দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকায় কাহার কাহার মৃতদেহে ক্ষতের চিহ্ন দেখা গিয়াছে, মরিবার পূর্ব্বে কাহার মুখে রক্তস্রাব দেখা গিয়াছে, কে ক্ষয় কাশী বা যক্ষ্মা কাশীতে মরিয়াছে এমন কি কাহার গৃহে কণ্ঠে রজ্জু সংলগ্ন মৃত গরু পড়িয়া আছে, মুখ ব্যাদান করিয়া ব্রাহ্মণ সেখানেই গিয়া হাজির "এইবার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" আম্রষষ্ঠী ঝিঙ্গাষষ্ঠী, মূলাষষ্ঠী, তালনবমী অশোকাষ্টমী, দূর্ব্বাষ্টমী, জামাই ষষ্ঠী ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ ধনী দরিদ্র সকলকেই সমভাবে শোষণ করিতে লাগিলেন। একদিকে সহরে সহরে তীর্থের নামে পুণ্যের হাট বসাইয়া ব্রাহ্মণ সস্তাদরে পুণ্য বিক্রয় করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে কোটি কোটি নরনারী সারাজীবন পাপ করিয়া তাহা তীর্থক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দিতে চলিল। সমাজের অসংখ্য নরনারী কেহ কৃষকরূপে, দূলে বেহায়ারূপে সূত্রধররূপে, চূর্ণকার রূপে, কেহ নাপিত রূপে, কর্ম্মকার রূপে কোন না কোন রূপে পরিশ্রম দ্বারা সমাজ সেবা করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ এই সব ব্যবসায় গ্রহণ করেন নাই কারণ ইহাতে মূলধনের প্রয়োজন আছে। তাই তিনি পরকালের জন্য শ্রাদ্ধে পিণ্ড-চটকান, মুক্তিদান, উদ্ধার করা প্রভৃতি বিনা মূলধনের ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে সাক্ষ্য, দলিল বা প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

রঘুনন্দন এইবার তাঁহার ভেদনীতির তৃতীয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ; বৈদ্য কায়স্থ নবশাখ হইতে ডোম মেথর পর্য্যন্ত সকলকেই দ্বিজদাস, শূদ্র বা গোলাম বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তারপর শূদ্রের মধ্যে কাহাকেও সৎ বা অসৎ শূদ্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যেন গোদের উপর বিস্ফোটক। সৎশূদ্র অর্থে ভাল চাকর। রঘুনন্দন-প্রদত্ত এই কলঙ্কটীকা কপালে পড়িয়া অব্রাহ্মণ প্রত্যেকেই অন্য হইতে নিজেকে একটু একটু বেশী কুলীন মনে করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের

পদাঘাত ও কর্ণমর্দ্দন নীরবে গলাধঃকরণ করিয়া এক শূদ্র বা গোলাম বা অন্য শূদ্র গোলামের উপর অত্যাচার করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করিল না। রঘুনন্দনের ইঙ্গিত অনুসারে সকল শূদ্রেরই মর্য্যাদা যে একপ্রকারের তাহা অনেকেই ভুলিয়া গেল। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সামাজিক ব্যাপারে শূদ্রের বসিবার স্থান ব্রাহ্মণের আসন হইতে পৃথক। ব্রাহ্মণের হুঁকায় শূদ্র তামাক খাইতে পারিবে না। শূদ্রের সম্মুখে দেবতার ভোগ চলিবে না, ব্রাহ্মণের গৃহে সামাজিক ভোজনের পর শূদ্র স্ত্রীপুরুষকে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে হইবে, শূদ্রের শবানুগমন করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইবে, শ্মশানে শূদ্রের চিতাভস্মের নিকট ব্রাহ্মণের শবদাহ চলিবে না, শূদ্রের বেদে ও গায়ত্রীতে অধিকার নাই, শূদ্র ওঁ, স্বধা বা স্বাহা আদি শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিবে না, শূদ্র ওঁ স্থলে নমঃ বলিবে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের বাড়ীর দেব বিগ্রহকে প্রণাম করিবে না, শূদ্রের বাড়ীতে দেববিগ্রহ যে পক্বান্ন ভোজন করে ব্রাহ্মণ তাহা ভোজন করিতে পারে না, শূদ্রের বাড়ীর দেবতা জাতিতে শূদ্র সুতরাং তাহার ভোগ খাইলে শূদ্রান্ন ভোজনের পাপ হয়, ব্রাহ্মণের বিগ্রহ ও প্রতিমাকে শূদ্র স্পর্শ করিলে বিগ্রহের জাতিপাৎ হয়—বিগ্রহকে গোবর চোনা পঞ্চগব্য খাওয়াইয়া তবে শুদ্ধ করিতে হয়। ব্রাহ্মণের শালগ্রাম শূদ্রের বাড়ীতে যাইবে না গেলে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া ঘরে তুলিবে, শূদ্রপ্রদত্ত ব্রত ভিক্ষা দান খাদ্যদ্রব্য বা জল ব্রাহ্মণের নিকট অগ্রাহ্য, অশূদ্র প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ-সদ্ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণেরা অসদ্ব্রাহ্মণ, শূদ্রের বা শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট জল সদ্ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-আহ্নিক পূজায় অব্যবহার্য্য। রঘুনন্দন ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে এইরূপ ভেদবৈষম্যের মহাপ্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ধৃষ্টতা

বল্লাল ও রঘুনন্দনের বরে দেশে একদল জীবের সৃষ্টি হইল। তাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, দুই চারিটি সংস্কৃত শ্লোক সম্বল করিয়া অগণিত শূদ্রের চক্ষুকে ধূলি দিতে লাগিলেন ও যাদুকরের ন্যায় দেশে অন্ধ কুসংস্কারের

রাজত্ব বিস্তার করিতে লাগিলেন। ইহারাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ইহারা নিজেকে ভগবানের মন্ত্রী বলিয়া মনে করেন, শূদ্রের অজ্ঞতা ও কয়েকটি সংস্কৃতের বচনই ইহাদের জীবিকার মূলধন। কেহ কেহ ইহাদের মধ্যে মহাপাপের অবতার কিন্তু অন্যের পাপ খালনের জন্য ইহারা পাঁতি ও ব্যবস্থা দিতে সুদক্ষ। মূর্খ ঠকাইতেই শুধু ইহাদের শাস্ত্রীয় ব্যবসায় নতুবা শাস্ত্র মানিতে ইহারা নিজেরাই প্রস্তুত নহেন। শুভ কার্য্যে অশুভ কার্য্যে ইহারা যজমানের সাধের সাথী। কবে একাদশী হইবে, কবে হলচালনা বা ঔষধ সেবন বিধেয়, টিকটিকী দক্ষিণ স্কন্ধে পতিত হইলে কি ফল, ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধের পিণ্ডদানে কত পুণ্য, মা কালীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠার শুল্ক কত ইত্যাদি সব সংবাদই যজমানেরা ইহাদের নিকট হইতে শুনিয়া লয়। যখন মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই তখনই ইহাদের সুবিধা ছিল বেশী। যজমানের ধর্ম্ম কর্ম্ম, ইহকাল পরকালের যাহা কিছু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ীর কীটদষ্ট তালপাতার পুঁথির কোণেই লিখিত থাকিত। যজমান যথোচিত শুল্ক ব্যয়ে তাহা মধ্যে মধ্যে শুনিয়া আসিত। শাস্ত্র গ্রন্থের অবাধ প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলের গৃহেই শাস্ত্র গ্রন্থ আসিয়া পৌঁছিতেছে। সকলেই শাস্ত্রের রহস্য ধরিয়া ফেলিতেছে। রঘুনন্দনের শূদ্র দলন কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শাস্ত্র, ধর্ম্ম, ঋষি ও ভগবানের নামে যে সব ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন আজ তাহা একে একে বাহির হইয়া পড়িতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী প্রদত্ত হইল।

একাসনোপবেশী কট্যাং কৃতাঙ্ক নির্ব্বাস্যঃ। (বিষ্ণু সংহিতা ৫।২০) অর্থাৎ শূদ্র ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিলে রাজা তাহার কোমরের নীচে দাগ দিয়া নির্ব্বাসিত করিবেন। "কামকারেণাস্পৃশ্র স্ত্রৈবর্ণিকং স্পৃশন্ বধ্যঃ। (ঐ ৫।১০৩) অর্থাৎ শূদ্র স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে স্পর্শ করিলে রাজা তাহাকে বধ করিবেন। "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ (ঐ ৭১।৪৮) অর্থাৎ শূদ্রকে সদুপদেশ দিবে না। "নচাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মম্ (ঐ ৭১।৫১) অর্থাৎ শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ দিবে না। "বেদমুপশৃন্বত স্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপতিপূরণমুদ্রা-হরণে জিহ্বাচ্ছেদ (গৌতম ১২) অর্থাৎ শূদ্র বেদমন্ত্র শুনিলে রাজা তাহার কর্ণকে সীসা ও জৌ গলাইয়া ভরাট করিয়া দিবেন এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে জিহ্বাচ্ছেদ করিবে। "বধ্য রাজা সবৈ শূদ্রো জপহোম পরশ্চ যঃ॥ (অত্রি ১৯) অর্থাৎ শূদ্র জপহোম পরায়ণ হইলে রাজা তাহাকে বধ করিবে। "দুঃশীলোঽপি

দ্বিজ পূজ্যো নতু শূদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ। কঃ পরিত্যজ্য দুষ্টাং গাং দুহেচ্ছীলবতীং খরীম॥ (পরাশর ৮।৩২) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দুঃশীল হইলেও পূজ্য, শূদ্র সংযতেন্দ্রিয় হইলেও পূজ্য নহে, কে দুষ্টা গাভীকে ত্যাগ করিয়া সুশীলা গর্দ্দভীকে দোহন করে? শূদ্রং তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতম ক্রীতমেব বা দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোসেয় ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥ (মনু ৮।৪১০) অর্থাৎ ক্রীতই হউক অক্রীতই হউক শূদ্রের দ্বারা দাসত্ব করাইয়া লইবে কেননা ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিতেই ভগবান তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

এইব শ্লোক রচনা করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শূদ্রের মান অপমান জীবন মরণ লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছে। এখনও পুরোহিত আসিয়া পূজা পার্ব্বণে, বিবাহে শ্রাদ্ধে শূদ্র যজমানের মৃত মাতা পিতাকে দাসী ও দাস বলিয়া সম্বোধন করায়। এখনও শিশু ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ শূদ্রের মস্তকে সানন্দে পা তুলিয়া দেয়। এখনও পুরোহিতের আদেশ ছাড়া শূদ্র ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারে না।

ব্রাহ্মণ শূদ্রের বেলায় পুরাতন জীর্ণ পুঁথির সবটুকুই মানাইতে চায় কিন্তু সম্বন্ধে ঠিক বিপরীত। ত্রিকালদর্শী ঋষি সত্যই লিখিয়াছিলেন "পূর্ব্বং যে রাক্ষসা রাজংস্তে কলৌ ব্রাহ্মণা স্মৃতাঃ। পাষণ্ডনিরতা প্রায়ো ভবন্তি জনবঞ্চকাঃ॥ অসত্য বাদিনঃ সর্ব্বে বেদ-ধর্ম্ম বিবর্জ্জিতাঃ। দাম্ভিকা লোকচতুরা মানিনো বেদবর্জ্জিতাঃ॥ শূদ্র সেবা পরাঃ কেচিন্নানাধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ॥ (দেবী ভাগবত ৬।১২) অর্থাৎ পূর্ব্বযুগে যাহারা রাক্ষস ছিল তাহারাই কলিযুগে ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই জন্য কলির ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই পাষণ্ড মতাবলম্বী, বঞ্চক, মিথ্যাবাদী, বেদোক্ত ধর্ম্মবিহীন, দাম্ভিক, চতুর, অভিমানী বেদজ্ঞান শূন্য ও শূদ্রসেবী হয় এবং নানা প্রকারের উপধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে। অনুতা হ্যনধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ। তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্ত প্রদো হি সঃ (পরাশর ১।৫৬)। বেদ পাঠহীন মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণ যে গ্রামে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে সেই গ্রামের অধিবাসীগণকে রাজা দণ্ড প্রদান করিবেন।" ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাই সর্ব্বাগ্রে শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন। মনু বলিলেন "সেবা শ্ববৃত্তিরা খ্যাতা তাং পরিবর্জ্জয়েৎ (মনু ৪।৬) অর্থাৎ কুকুর বৃত্তি চাকুরীকে পরিত্যাগ করিবে। কতজন পণ্ডিত এই শাস্ত্র মানেন? মাসিক বেতনে শিক্ষকতা করিতে কিংবা পুত্রকে কেরানীগিরি করাইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা মহর্ষি মনুর এই বিধানের

দিকে ফিরিয়াও তাকান না। বশিষ্ঠ বলিলেন "ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত (বসিষ্ঠ ১৬) অর্থাৎ ম্লেচ্ছভাষা শিখিবে না। গৌতম বলিলেন "ন ম্লেচ্ছশুচ্য ধার্ম্মিকৈ সহ সম্ভাষেত। (গৌতম ৯) অর্থাৎ ম্লেচ্ছ, অশুচি ও অধার্মিকের সহিত কথা কহিবে না। বিষ্ণু বলিলেন "ন ম্লেচ্ছ বিষয়ে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ (বিষ্ণু ৮৪।১) অর্থাৎ ম্লেচ্ছ রাজ্যে শ্রাদ্ধ করিবে না। "ন গচ্ছেন ম্লেচ্ছ বিবরম্ (ঐ ২) অর্থাৎ ম্লেচ্ছাধিকৃত দেশে যাইবে না। পূর্ব্ব পুরুষের রচিত এই সব শাস্ত্র মানিতে গেলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের নিজেদেরই অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। মনুর মতে ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেবং গুর্ব্বাঙ্গনা গম। মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপে তৈঃ সহ। অর্থাৎ মহাপাতক পাঁচটি ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুপত্নী হরণ এবং ইহাদের সংসর্গে থাকা।" আজ একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও দেশে নাই যিনি উক্ত মহাপাতকীদের সঙ্গে সমাজে বাস করিয়া মহাপাতকী না হইয়াছেন। অনেকে নিজেই উক্ত পাঁচটির কোন না কোন একটিতে সুদক্ষ। এইসব পাতিদাতা, ছুৎমার্গী, নস্যসেবী, পরোপদেশে দক্ষ, নিমন্ত্রণ প্রিয়, দাক্ষিণালোভী, শূদ্রসেবী, হীনচেতা, স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হাত হইতে সমাজকে বাঁচাইতেই হইবে।

আর্য্য-ঋষিগণের রচিত সমাজকুঞ্জ আজ কয়েকজন পাণ্ডা গোঁসাই, পুরোহিত, পণ্ডিত, মোহান্ত ও গুরুর করতলগত কতকগুলি শঠ, প্রতারক ধাপ্পাবাজ সুবিধাবাদী ও আরামপ্রিয় ভণ্ড অসংখ্য নরনারীর উপর অবাধে নরক রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। অসংখ্য কুসংস্কার, মিথ্যা ধারণা ও দুর্ব্বলতাই এই পাপ রাজ্যের ভিত্তি। মানবের যাবতীয় পরাধীনতা এই ভিত্তির উপরেই গড়িয়া উঠে। ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতা হঠাৎ একদিন আকাশ হইতে পড়ে নাই। সামাজিক কুসংস্কারের পুঞ্জীভূত জঞ্জালই ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছে এবং দিন দিন ইহাকে সবল করিয়া তুলিতেছে। যাহারা মনে করেন স্বাধীনতা পাইলে একদিনেই আইনের বলে সামাজিক কুসংস্কারকে তাড়াইব, তাহারা ভ্রান্ত। জগতের বড় বড় স্বাধীনরাজ্য এখনও আইনের বলে দুর্নীতি, কুসংস্কার ও মিথ্যা ধারণাকে উঠাইয়া দিতে পারে নাই। ধর্ম্মনীতিক কুসংস্কার সামাজিক কুসংস্কার সৃষ্টি করে এবং সামাজিক কুসংস্কারই রাজনৈতিক পরাধীনতা আনয়ন করে। ধর্ম্মনীতিতে নানারূপ গোঁজামিল দেওয়াতেই আজ হিন্দু সমাজ কুসংস্কারের দাস এবং এই সামাজিক কুসংস্কার যতদিন চলিবে প্রকৃত স্বাধীনতা ততদিন সুদূরেই অবস্থান করিবে।

ইহকাল পরকাল, শাস্ত্র ঋষি, ধর্ম্ম, পুণ্য, মোক্ষ বা কৈবল্যের নামে আজ এই অন্নবস্ত্র সমস্যার দিনে দেশময় শত সহস্র অবতার মঠ, মন্দির, আশ্রম, আস্তানা, গজাইয়া উঠিতেছে। ইহাতে একদল শঠ ও ধূর্ত্তের সহজেই বেকার সমস্যার সমাধান হইতেছে। কোটি কোটি নরনারী পুণ্য লোভে সর্ব্বশান্ত হইতেছে। আজ এই মিথ্যার রাজত্বকে ধ্বংস করিতে হইবে। ব্রাহ্মণের হাতে আজ শূদ্র নির্য্যাতিত, পুরুষের হাতে নারী লাঞ্ছিত, ধনীর হাতে আজ দরিদ্র নিগৃহীত, পণ্ডিতের হাতে মূর্খ প্রতারিত, রাজার হাতে প্রজা নিষ্পিষ্ট। অত্যাচারের উদ্ধত গতিকে আজ রুদ্ধ করিতে হইবে। আজ চাই যুব শক্তির উদ্বোধন, নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে আজ বিপ্লবের আগুন জ্বালাইতে হইবে। কোটি কোটি নরনারীকে আজ দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে হইবে। অত্যাচারের তীব্রবহ্নি নির্ব্বাপিত হউক; জগৎ মধুময়, আনন্দময় ও শান্তিময় হউক।

ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।